DISCUSSION ON PROFESSIONAL THEATRE FROM THE COLLECTIONS OF NATYA SHODH SANSTHAN AUDIO LIBRARY

নাট্য শোধ সংস্থান আয়োজিত আলোচনাচক্রের সম্পূর্ণ প্রতিবেদন

তৎকালীন পেশাদারী থিয়েটারের একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা
১৯ জুন ১৯৮৩

এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন
প্রতিভা অগ্রবাল, পবিত্র সরকার, দেবনারায়ণ গুপ্ত, অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ, দেবাশিস দাশগুপ্ত, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, শিবকুমার যোশী, এবং স্বরণ চৌধুরী
এটি সংস্থান আয়োজিত দ্বিতীয় আলোচনাচক্র।

NATYA SHODH SANSTHAN
EE 8, SECTOR 2, SALT LAKE, KOLKATA 91
MAIL:natyashodhsansthan@gmail.com
Phone (033)23217667

পবিত্র সরকার[i]

কলকাতার বাংলাভাষী যেটা পেশাদারী থিয়েটার, রঙ্গমঞ্চ, সেই সম্বন্ধে আজ আলোচনা হবে। তো এখানে যারা উপস্থিত আছেন, শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়,[ii] শ্রী রবি ঘোষ,[iii] নাটকের সঙ্গে যুক্ত যে দুজন আছেন, তাঁদের ঠিক পেশাদারী থিয়েটারের প্রতিনিধি বলতে আমার একটু দ্বিধা আছে। কারণ, আপনারা সবাই জানেন যে ওঁরা বাংলাদেশের যেটা গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন। সেখান থেকে গেছেন যদিও একটা অন্য ধরনের প্রণালীবদ্ধ থিয়েটারের মধ্যে, তবু ঠিক ঝাঁকের কৈ ঝাঁকে মিশে যাবার মত অবস্থায় তাঁরা পৌঁছননি। তাঁদের এক ধরনের থিয়েটার করতে হচ্ছে, খুব বেশি পেশাদারী আর এক ধরনের থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। যে থিয়েটার শুধুই টাকা রোজগার করতে চায় আর পাঁচটা ব্যবসার মত, সেই থিয়েটারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ওদের একটা অন্য ধরনের খানিকটা স্বাস্থ্যকর একটা নাটক চালিয়ে যেতে হচ্ছে। আরেকজন আমাদের অতিথি যিনি আজকে আসবেন, শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত,[iv] তিনিও। তাঁর সম্বন্ধেও এটা বলা যায়, যদিও প্রথাগতভাবে পেশাদারী থিয়েটারের সঙ্গে তিনি ছিলেন এবং আছেন, তা সত্ত্বেও যে তাঁর থিয়েটার মোটামুটিভাবে ঠিক ব্যবসায়িক থিয়েটার যাকে বলে সেই –তার ধারাগুলো, তার লোভের রাস্তাটা অনুসরণ করেনি, যদিও তিনি যথেষ্ট সফল হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে। তবু জ্ঞানেশবাবুর ও রবি ঘোষ মশায়ের যে অভিজ্ঞতা, এ অভিজ্ঞতাটা আমাদের কাছে খুব মূল্যবান। যে তাঁরা গ্রুপ থিয়েটার থেকে

গেলেন, গিয়ে একধরনের system-এর মধ্যে পড়লেন, পড়ে কি ধরনের সমস্যা, কি ধরনের প্রতিযোগিতা, তার মধ্যে তাঁদের ব্যক্তিগত বিবেক এবং শিল্পীসত্ত্বা কিভাবে টিকিয়ে রাখতে তাঁরা কতটা পারছেন, কতটা আপোষ করতে হচ্ছে, কিভাবে, সে সম্বন্ধেই আমাদের প্রশ্নগুলো মূলত উঠবে এখানে। আমি প্রথমে শ্রী জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং মতামত দিতে বলব।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত বন্ধুরা, পবিত্র সরকার, আমাদের- আমি এবং রবির পেশাদার মঞ্চের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে কথা বললেন, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন, কারণ আমরা দুজনেই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, আছি এবং এখনো থাকব। পেশাগত ব্যাপারে আমাদের পেশাদার মঞ্চে যে উপস্থিত হতে হয়েছে, সেখানে গিয়ে পড়েছি। আমি actually পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ১৯৭১ সাল থেকে। সেই সময় আমার এক বন্ধু, হরিদাস সান্যাল, তিনি বললেন, তিনি একটি নাটক করতে চাইছেন পেশাদার মঞ্চে, সে নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব আমি নিতে পারি কিনা। সে মুহূর্তেই নানারকম প্রশ্ন - তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি, মতবিরোধ হল। কারণ, আমরা যে জাতীয় নাটক করতে অভ্যস্ত, সেই জাতীয় নাটকের নাম যখন তার কাছে প্রস্তাব রাখা হল, তিনি বলতে লাগলেন, এই নাটক সাধারণ মানুষের জন্যে নয়। আপনারা যে নাটক বলছেন সেই নাটক উন্নত মানের। সেটা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করবে না এবং পেশাদার মঞ্চের উপযুক্ত নাটক নয়। আমি কিন্তু কথাটা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি না। করি না এইজন্যেই, নাটক –তার বক্তব্য থাকবেই। বক্তব্য ছাড়া কোন ভাল নাটক হয় না। আমরা যুগে যুগে দেখে এসেছি, নাটকের মধ্যে বিশেষ বক্তব্য যেটা থাকে সেইটাই বেশী সাফল্যলাভ করে, সেইটাই জনপ্রিয় হয়। কিন্তু যেহেতু তিনি সেখানে অর্থলগ্নী করছেন, তাঁর কথার দামটাই বেশি হয়। সেখানে আমাদের কিছু কিছু কম্প্রোমাইজ করতে হয়। ফাইনালি, কম্প্রোমাইজ করে আমরা ঠিক করলাম, যে কি নাটক আমরা করব। তখন ঠিক হল তারাশঙ্করের[v] 'বাঘিনী'[vi] করা হবে। 'বাঘিনী'র ব্যাপারে আমি একটু আপত্তি করলাম, যে এইটা না করে আরও ঘরোয়া কিছু করা যায় কিনা একবার চিন্তা করে দেখা যাক। সেইসময় নাট্যকার বীরু মুখোপাধ্যায়,[vii] তিনি ফিল্মের জন্য যে 'মল্লিকা'[viii] নাটক এখন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে[ix] চলছে, একটা ফিল্মের স্ক্রিপ্ট তাঁর করা ছিল। তিনি বললেন যে, এইটা করা যেতে পারে। তখন আমরা বললাম, আচ্ছা করা যাক, দেখো কি হয়। নাটকটাকে সাজানো হল, নাটকের মধ্যে বিশেষ বক্তব্য কিছু নেই, প্রবলেম বলেও কিছু নেই। কিন্তু একটা মোটা দাগের, একটা ইমোশনাল গল্প আছে। সেই গল্পটাই সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হল। যদিও তার প্রয়োগরীতি বর্তমান দিনের মত

করে সেখানে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং তখন নাটক করতে গিয়ে, আমরা আগেও দেখেছি যে পেশাদার মঞ্চে কিছু কিছু gimmicks না থাকলে দর্শককে আকর্ষিত করা যায় না। সেই gimmicks এর চিন্তা তখন মাথায় এলো। কি gimmicks করা যায়! ওখানে একটা গাড়িতে একটা kidnapping scene আছে। একটা মোটরকার কিডন্যাপ করছে। সেটাকে আমরা technically দেখাব ঠিক করলাম এবং তাপস সেন সেখানে অভাবনীয় সাফল্যলাভ করলেন সেই gimmick–টা দেখাতে। সেই গিমিকটা, যেটাতে মোটরগাড়ি চালানোর ব্যাপারটা হল সেটা সাফল্যলাভ করল এবং নাটকও অভাবনীয় সাফল্যলাভ করেছিল সে সময়। ১৯৭১ সাল থেকে সেটা ছশো সত্তর রাত্রি continuous চলেছিল। চলার পর নায়িকার সঙ্গে সামান্য একটা মতবিরোধ হয়। মতবিরোধের জন্য নায়িকা –তিনি ছেড়ে চলে গেলেন। তারপরে নাটকটাকে বন্ধ করে দিতে হল। এবং নাটকটা আজকে ১০-১২ বছর পার হয়ে গেছে, তারপরেও যখন নাটকটা দ্বিতীয়বার অভিনয় করতে নেমেছেন, সেই team নেই, সেই অভিনয়ের জোর নেই, কিন্তু গল্পের জোরেই হোক বা বিশেষ কোন কারণেই হোক, সে নাটকটা আজও ভালোভাবেই চলছে। জানি না আর কদিন চলবে। এই হচ্ছে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এর পরেও –হয়ে যাবার পরেও যখন বলা হল যে আবার আমি নতুন নাটক করি–আমাদের ঐ প্রযোজক, তিনি বললেন, আমার টাকা ফেরৎ চাই,টাকা আমি আনতে চাই। মৌলিক নাটকের দিকে তিনি নজর দিলেন না। তিনি মলাটের দিকে নজর দিলেন। সেই সময়ে তারাশঙ্করের 'না'[x] নাটক আমরা সেখানে উপস্থিত করেছিলাম। 'না'ও সেখানে সাফল্যলাভ করেছিল সেদিন। তারপরে আবার অনেক রকম কথা হল, যে আমরা একবার এটা করব যেটা শুভেন্দু [xi]করেছিল পরে –'কালবৈশাখী', All My Sons। সেটা করবার একটা proposal দিয়েছিলাম বা গ্রুপ থিয়েটারের কিছু কিছু ভাল নাটক করবার–যেমন আমি একবার বলেছিলাম মানিক বন্দোপাধ্যায়ের[xii] 'হারাণের [xiii]নাতজামাই' করা হোক। সেটাও তিনি শোনেননি। তারপরে ঠিক করা হোল কমেডি (comedy) করা হবে। বনফুলের[xiv] কমেডি- কি নাম ছিল যেন? এখন যেটা 'অঘটন' নামে চলছে আর কি–'ভীমপলশ্রী'[xv]। সেইটা নাটকটা ওইখানে করা হল এবং সেটাও successful। তারপরে আমি ধরুন গ্রুপ থিয়েটারের যে নাটক আমরা করেছিলাম ১৯৫৯ সালে, 'ভাঙাগড়া খেলা'[xvi] বলে, যে নাটকটা বিশেষ করে চরিত্র প্রধান নাটক ছিল, নাটকের বক্তব্য ছিল - যদি কোন মহিলা দেখে যে তাঁর অত্যাচারী স্বামী আছে, তাঁকে আমরা নাটকে দেখিয়ে ছিলাম যে তাঁকে ছেড়ে আসার যথেষ্ট right আছে এবং তিনি ডিভোর্স নিতে পারেন। এ নাটকটা যখন করলাম, করবার পরে দেখা গেল, এ নাটক কিন্তু সাধারণ মানুষ গ্রহণ করলেন না। তাতে বোঝা যাচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও একটা কুসংস্কার চলে এসেছে –কুসংস্কার সেইটাই যে বাঙালি মহিলা, তিনি স্বামীকে ত্যাগ করবেন না, স্বামী যত অত্যাচারীই হোক। ইবসেন 'Doll's House' যেটা করেছিলেন, সেই সময় ইবসেনকে অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। এখনো দেখা যাচ্ছে যে বাঙালি সমাজের মধ্যে এই ব্যাপারটা এখনও রয়ে গেছে। এ নাটকটা খুব একটা successful হয়নি। তারপরে আমি করেছি 'কলরব' বলে একটা নাটক, ঘরোয়া নাটক, সেটাও কিন্তু উপন্যাসের নাট্যরূপ। সেটা শক্তিপদ রাজগুরুর[xvii] গল্প থেকে করা। সেটা মোটামুটি successful হয়েছিল। কিন্তু সেটা বেশী এগোতে পারল না তার কারণ, তার expenditure এত বেশী ছিল, সেটা cover করা গেল না certain time এ এসে। তারপরে last করেছিলাম কানাই বসুর 'গৃহপ্রবেশ' বলে একটা গল্প। ওইটা একটা মৌলিক নাটক ছিল। তিনি এটা মৌলিক নাটক করেছিলেন। তা সেটার সঙ্গে আমি প্রথমের দিকে বেশী যুক্ত হতে পারিনি। কারণ আমার ব্যক্তিগত কতকগুলো ব্যাপার ছিল। আমি প্রোডাকশানটাকে একটাভাবে ready করে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম বাইরে। বাইরে থেকে ঘুরে এসে দেখলাম যে আমি কি গড়তে চেয়েছিলাম আর কি গড়ে রয়েছে। মানে আর্টিস্টরা নিজেদের মত যা খুশি করে রেখেছে। আবার তাকে ভাঙতে ভাঙতে - তখন দর্শক সব চলে গেলেন, দর্শক আর এলেন না। তারপর এখন

এসে একটা করছি আমি এটা - Oliver Goldsmith নাটক থেকে নেওয়া, 'She Stoops To Conquer' থেকে –যেটা 'শ্রীমান শ্রীমতী'[xviii] নামে–এখন দেখলাম হাস্যরস লোকে নিচ্ছে, এটা ভালোই চলছে আর কি। হাস্যরসের ব্যাপারে –রবিবাবু তো হাস্যরস নিয়েই নাড়াচাড়া করছেন, ওনারটাও ভালোই চলছে। আমাদের দর্শক কি বদলে গেল কিনা সেটাই এখন আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যে তাঁরা খুব গভীর কথাপূর্ণ কোন নাটক গ্রহণ করতে চাইছেন না বা ভালো লাগছে না তাঁদের –এটা কিন্তু আমাদের একটা আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে বোধহয় দেবাশিসবাবু[xix] খানিকটা জট খুলতে পারবেন। আমার মোটামুটি অভিজ্ঞতা এইটাই। আমি চেয়েছিলাম আজকে আমাদের দেবুদা, মানে দেবনারায়ণ গুপ্ত আসলে ওনার কাছ থেকে পুরনো দিনের অনেক কথা শুনতে পারতাম। যাই হোক, পশুপতিদা এসে গেছেন, ওনার কাছ থেকে অনেক কথা জানা যাবে, অনেক কিছু শোনা যাবে বিশ্বাস আছে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

পবিত্র সরকার

আচ্ছা, প্রশ্ন-উত্তরের ব্যাপার আছে, মনে হয় সকলের বলা হয়ে গেলে আপনারা আলাদা আলাদা মানুষকে প্রশ্ন করবেন এবং তার উত্তর পাবেন। আমি এবার শ্রী রবি ঘোষকে বলতে অনুরোধ করছি---

রবি ঘোষ

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আমার নিজের একটা বিরাট অভিজ্ঞতা আছে personally। মিনার্ভা থিয়েটারে যখন আমরা নিই, প্রথম আমরা- গ্রুপ থিয়েটার- বোধহয় তার আগে শম্ভুবাবু চালিয়েছিলেন একমাস, পারেননি, চলে এসেছেন। আমরা নিলাম, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, ১৯৫৯-এ। তখন দারুণ সব - 'উল্কা'[xx] চলছে, ওদিকে 'শ্যামলী'[xxi] চলছে, হিট নাটক সব চলছে। তা আমাদের গ্রুপ থিয়েটার বাইরে যে নাটকগুলো করত, যেমন এখন সব গ্রুপ থিয়েটার করেন, তখন আমাদের প্রচণ্ড হিট নাটক ছিল 'নীচের মহল'[xxii]। গোর্কীর 'Lower Depth' আর ছিল 'ছায়ানট', উৎপল দত্তের লেখা একটা নাটক। –hilarious comedy ends with a tragedy আর কি, এরকম ছিল। আমরা ভাবলাম যে, আমরা একটা নতুন দিগন্ত দেখাব। যেটা হয় আর কি, এক-একটা বয়সে হয় না, যে আলো দেখাব। সবাই Jesus Christ মত একটা ভাব নিয়ে থাকে সব সময়। আলো দেখাবার মন নিয়ে গেছিলাম ওখানে। গিয়ে আমরা দেখলাম প্রথমে 'ছায়ানট' করলাম, একমাসে উঠিয়ে দিতে হল। যেখানে accommodation সাতশো, হলে লোক দাঁড়াল গিয়ে পঞ্চাশটা থেকে তিরিশটা। সেকেন্ড করলাম আমরা 'ওথেলো'[xxiii]। সেও মাস দেড়েক পর। সেও ধরুন বাইরে যখন করতাম, প্রচণ্ড ভিড় হত। তখন তো অ্যাকাডেমি ছিল না। তখন নিউ এম্পায়ার ছিল। খুব লোক আসত, একটু push sale ছিল।

এখানে ওই রকম এক-দেড়মাসে উঠে গেল। তারপর সবচেয়ে বড় যেটা অ্যাসেট যেটা ছিল আমাদের – 'নীচের মহল', আমার মনে আছে, last যেদিন শো হয়, সেদিন হলে ছিল পঁচিশটা লোক এবং ফার্স্ট রো'তে রবিশঙ্কর[xxiv] দেখছেন। দেখলেন, দেখে back stage এসে বললেন, "এত সুন্দর নাটক লোকে দেখে না?" আমরা বললাম, "দেখলো না তো!" বললেন, "আপনারা নেক্সট নাটক করলে আমি আপনাদের মিউজিক করে দেব"। তখন আমাদের আলোচনা চক্র বসেছিল মনে আছে এখনও, সেটা থেকে সূত্র ধরে বলব পরে আমার অভিজ্ঞতা, যে আমরা তো ঐ রকম কান্নাকাটি করতে পারব না, ক্লিশে যেসব ব্যাপার হয়, –ওরে গেল রে বলে চিৎকার করে অভিনয়-টভিনয়, ওটাও করতে পারব না আবার যা করছি সেটা তো নিল না পাবলিক, তো আমরা কোথায় যাব? আমাদের মাথায় তখন আশি হাজার টাকা লোন। তখন একটি ছেলে, আমাদের গ্রুপের সেক্রেটারি ছিল কমল মুখার্জি বলে, তাপসদা-টাপসদা সব বসে ছিল, সে বলল, "দেখুন, যেটা এখন বর্তমান থিয়েটারে হচ্ছে না, আসুন আমরা সেটা করি না স্টেজের ওপর। কি? না locale টা চেঞ্জ করি। এই যে ঘরের মধ্যে সব সেট হয়, এটাকে বাদ দিয়ে - বাদ দিয়ে এমন কিছু –অর্থাৎ gadgetry-র দিকে গেল আর কি। জ্ঞানটা দিল –সেটা বোঝা গেল পরে। কি? কি? করতে করতে আমাদের কয়লার খনির germinal-টা মাথায় এলো আর কি – জোলার (Zola) যেটা –ওইটেকেই ভেঙেচুরে –আমরা কয়লাখনিতে গেলাম - উৎপলদা মোটামুটি একটা খাড়া করলো–'অঙ্গার'[xxv]। 'অঙ্গার' কুড়ি নাইটের পর থেকে ফুলহাউস ছিল up to three hundred nights। three hundred nights পর্যন্ত রোজ ফুল হাউস। আমাদের লোন-ফোন শোধ হয়ে গেল। তারপর যাকগে, ওটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর দীর্ঘদিন থিয়েটার করিনি। গ্রুপ থিয়েটার নিজে করেছিলাম – 'চলাচল'। সেখানে ছোট ছোট জায়গায় করতাম, লোক হত। তখন বায়স্কোপে নামও হয়ে গেছে আমার। তারপরে যখন প্রথম আমি প্রফেশনাল থিয়েটার করতে এলাম –'বিবর'[xxvi]। 'বিবর' শুনেই তো ভয় পেলাম, কারণ আমাদের তো অতীতের একটু ইয়ে আছে – আদর্শগতভাবে – বিবর? ভাবলুম, না, এই – inhibitions-টা কাটুক, পড়ি। পড়ে বললাম এই সব নোংরামো যে আছে, এ তো স্টেজে দেখাতে পারব না। ছেলেটি, সমর মুখার্জ্জি, যে এখন সব নৃত্য নিয়ে খুব famous হয়ে গেছে, ও কিন্তু মোটামুটি নাটকের একটা ধাঁচা জানে, প্রফেশনাল থিয়েটারের। জানে না বললে ভুল হবে। ও একটা কিন্তু নাটক দাঁড় করিয়ে দেবে। তো আমি বললুম যে এইসব নাচ বাদ দাও। একটা নাটক আছে - দেখলাম এই যে decadent একটা সোসাইটি, একটা ক্লাস, ভ্যালু নেই কোথাও, বাপেরও নেই, ছেলেরও নাই, আন্দোলন যে করছে তারও নাই, মা'রও নাই, কারো নাই, খুব মজা লাগল। ওইসব লোকজন দেখি চারিদিকে –ঠিক আছে এটা হলেও হতে পারে। তবে আমি ছোট পার্ট করব। সুপার হিট করল নাটকটা, একটা unknown জায়গায়, জায়গাটা popular হল। কিন্তু আমার ঐ একটা পয়েন্ট পর্যন্ত, গোলমাল হয়ে গেল, মালিকের সঙ্গে গোলমাল হয়ে গেল। আমরা তো আন্দোলন থেকে এসেছি, ফলে ওই মালিকানা ভাব দেখলেই মেজাজ গরম হয়ে যেত। হল কি, প্রায় ফুল হাউসে তিনশো পঞ্চাশ নাইটেই নাটক আমি বন্ধ করে দিলাম, ঝগড়াঝাঁটি করে। তারপর ঠিক করলাম কমেডি ছাড়া কিছু করব না। নাটক অনেকেই পড়ায়। যাঁরা নাটক লেখেন, প্রত্যেককেই আমি বলি, না ভাই। কারণ হয় কি by my professional habits আমাকে মাঝে মাঝেই দশ হাজার বিশ হাজার ফাংশানে পাবলিক ফেস করতে হয়। আর আমি মোটামুটি তাদের নার্ভটা বুঝতে পারি, পাবলিকের নার্ভটা কি -যখনই এরকম বড় ফাংশানে যাই, কিন্তু সেখানে কোন ভাল গান হয় না। ধরুন রবীন্দ্রসঙ্গীত হয় না সেখানে। বা নজরুল গীত হয় চিৎকার করে - নজরুল গীত হয় না। আর শিল্পীরা গান করেন তাঁদের সবচেয়ে সস্তার গানগুলো। ভাল গান কেউ শোনে না। মোটামুটি আইডিয়া হলো যে এই হচ্ছে mass psychology। এতদিন তো একটা অন্য জায়গায় ছিলাম। কমেডি আমি দেখলাম লোকে click করে। আমরা যে কমেডিটা শিখেছিলাম –mainly

উৎপলদার কাছে শেখা আরকি, slapstick form। তারপর বিদেশ থেকে শেখা – বিদেশের নানারকম জিনিস-টিনিস দেখে-টেখে, পড়ে-টড়ে যেটা typical Hollywood-এর ৪০'এর ছবিগুলোর যে ধাঁচা আর কি কমেডির, স্ল্যাপস্টিক কমেডি, আমি বললুম, স্ল্যাপস্টিক কমেডি স্টেজে হচ্ছে না। প্রফেশনাল থিয়েটারে স্ল্যাপস্টিক কমেডি করা যায় - দেখি না কি হয়! এমন তো হতে পারে যে রবি ঘোষকে দেখে কেন হাসবে? আমি যদি সিচুয়েশন তৈরী করব হাসির। আমি যদি সিচুয়েশন তৈরি করে দিই হাসির তাহলে কিন্তু এ-বি-সি-ডি অভিনয় করলেও same laughter হতে পারে। দ্বিতীয় নাটক নামাই 'ছদ্মবেশী'[xxvii], রঙমহলে[xxviii]। সেটাও প্রচণ্ড হিট করে। সেটা এমন কমেডি হয়েছিল যেটা এখনও মাঝে মাঝে বাইরে –ধরুন, মেদিনীপুরের পিংলা গ্রামে গিয়ে করে দেখেছি, যাত্রা ফর্মে। যা রি-এ্যাকশন হয়, কলকাতার অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড দর্শকের কাছে করলেও একই রি-এ্যাকশন হয়। আমার কাছে জিজ্ঞাসা করুন কি করে হয়? উত্তর দেব, ফর্মতো এটা, এ তো আমার কোন আবিষ্কার না, আমি সিচুয়েশনটা তৈরী করছি। কোথাও অনেক কিছু দেখেছি –একটা সিচুয়েশন, স্ল্যাপস্টিক একটা ফর্ম তৈরি করে ফেললাম। নাটকের গতির সঙ্গে সেটা মিলিয়ে দিলাম। মিলিয়ে দিয়ে সেটা অডিয়েন্সে রি-এ্যাকশন হচ্ছে। আপনি ছাড়া হতে পারে বা আমি ছাড়া –সবাই কমেডিয়ান।সেটাও ওই মালিকের সঙ্গে গোলমালে বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে, আমরা থিয়েটার করব না, নিজে প্রোপ্রাইটর হব। লাস্ট শেখর চ্যাটার্জি,[xxix] আমার বন্ধু, আমরা একসাথে নাট্য আন্দোলন করেছিলাম। ও এসে বলল –আমি তখন থিয়েটার করছিলাম না বহুদিন। আমার –হীরকরাজার[xxx] শুটিং চলছিল। সত্যজিৎবাবুর শুটিং চলাকালীন কোনও থিয়েটার করি না। তা হয়ে গেল যখন, ওকে বললাম, থিয়েটার করব। গৌতম রায়, 'ভয়ঙ্করী'[xxxi] যার লেখা, আমার কাছে বহুদিন ধরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমায় বলল, "রবিদা, শেক্সপিয়র থেকে"- আমি বললুম, "শেক্সপিয়র তো হয়নি, যাক গে তুমি ভাল করেছ, শেক্সপিয়রটা follow করেছ। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি একটা adaptation of Shakespeare করেছ। মোটামুটি কাহিনিটা বাঙালি কায়দায়, বিয়ে-থাওয়া নিয়ে একটা ঝামেলা পাকিয়েছো তুমি। এগুলো বাঙালিরা পছন্দ করে। মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না – হল, হতে হতে হল না, হলে কি হত এইসব ঝামেলা বাঙালিরা পছন্দ করে। তার মধ্যে যদি একটু কমেডি রস দিয়ে দেওয়া যায়। একটা কথা বহুদিন আগে শচীনবাবু, শচীন সেনগুপ্ত[xxxii], আমাদের একটা ঘরোয়া আসরে বলেছিলেন উৎপলদাকে, আমার সেটা এখনও মনে আছে। ১৯৫৪-৫৫-এ চীনের থেকে ঘুরে এসে–"উৎপল, কলকাতা বা বাঙালি দর্শকের কাছে, যাই কর, একটা গল্প বলার চেষ্টা করবে। তা নয়তো কিন্তু বাংলা দর্শক ধরতে পারবে না।" ওনার বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন তো, ওটা আমার মাথায় ছিল চিরকাল। তা আমি বললুম, থিয়েটারের গপ্পোটা খুব ভাল আছে। গপ্পোটা লোকে দেখবে। শেখর, এখন সেও নাট্য আন্দোলন করেছে। আগে নাটক করার জন্য তারও এরকম লোন হয়ে গিয়েছিল। আমায় বলল, "তুমি যদি join কর তো খুব ভাল হয়"। আমি বললুম, "join করলে আমি তো সবই নিজের মত করে করব। কারো under কাজ করতে পারব না। আমার এক উৎপলদা ছাড়া আর কারো under কাজ করা সম্ভব নয়"। তো কর। ও আমাকে অনেক নাটক বলল। আমি শেখরকে বললুম, "শোনো, তুমি আমাকে পরিষ্কার করে একটা কথা বল, কোন inhibition রেখো না, আদর্শ রেখ না মনের মধ্যে, মানে rigid কোন আদর্শ। তুমি ৮০ হাজার টাকা লোন শোধ দিতে চাও না সুনাম অর্জন করতে চাও, কি করতে চাও বল।" ওদের মিটিং-এ ছেলেদেরও বললাম। ওরা বলল, "না, আমরা ৮০ হাজার টাকা লোন শোধ করতে চাই। আমি বললুম, "তাহলে পরে 'ভয়ঙ্করী' লোন শোধ করাবে। কারণ, পাবলিক তুমি আমার চেয়ে বেশি চেনো না - আমি এত পাবলিক ফেস করি। তখন ঠিক হল, কিন্তু ছেলেরা সমস্ত unskilled। আমি, বাসবী নন্দী[xxxiii] এবং শেখর চ্যাটার্জি বাদে সব ছেলে unskilled, অ্যামেচারিস। ওদের লেভেলটা skilled প্রোফেশনালে আসেনি। নর্মালি আমি 'ছদ্মবেশী' নামিয়েছিলাম দশটা

রিহার্সালে। আমাদের সব প্রফেশনাল, skilled actor ছিল। তা আমি দুটো রিহার্সাল দিয়ে দেখলাম যে, হবে না। ওরা বলল, "নামবে না।" আমি বললাম, "একমাস রিহার্সাল দিতে হবে এবং সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত। six hours rehearsal দিয়েছিলাম, কুড়িটা। রিহার্সাল দিয়ে এখন আমি বললাম, "দেখ, তোর-আমার লেভেলে ওদের তুলতে পারব না তো, আমাদের একটু নামতে হবে। আমাদের নেমে মোটামুটি একটা parity ক্রিয়েট করতে হবে। যেটা সেকেন্ড গ্রেড হলেও কিন্তু skilled হবে। ফার্স্ট গ্রেড হবে না কিন্তু।" যেমন, 'ভয়ঙ্করী' নামালাম যখন, ফার্স্ট নাইটে আমাদেরই দাদারা, যারা আমাদেরকে নাট্যদল করতে দেখেছেন, কলকাতার বিখ্যাত পন্ডিত দাদা আমায় বলল, "এই করলে তুমি? ছেড়ে দাও। বন্ধ করে দাও"। আমি বললুম, "কেন দাদা? কি হল?" "এই trash! একি ব্যাপার!" "কেন গোলমালটা কি?" "না, এই এ্যাক্টিং-ফ্যাক্টিং হচ্ছে না"। আমি বললুম,"Ambassador গাড়ি, পিক-আপ নিতে সময় নেবে। মার্সিডিজ-বেঞ্জ গাড়ি নয়। আপনাদের মুস্কিল হল আপনারা ঐ কতকগুলো সেট, বিলেত-ফিলেত ঘুরে এসে দেখেছেন, তারপরে কি ঘটছে দেখছেন না। আপনি একশো নাইটে দেখতে আসবেন"। তো সেই ভদ্রলোককে একশো নাইটে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। দেখে বলছেন, "এ কি করে হল!" আমি বললুম, "আপনাকে আগেই বলেছিলুম, Ambassador গাড়ি, পিক-আপ নিতে সময় নেয়"। নিলে দেখবেন ঠিক চলছে। ভোঁ করে চলে যাবে"। তা আজকে এই ছ'শো-সাতশো নাইট হতে চলেছে, ওদের যে running, বলতে পারেন it is a super hit play! অভিজ্ঞতা একটাই বলব, কলকাতায়, নিশ্চয়ই জানেন সবাই, জ্ঞানেশও স্বীকার করবে, দেবুদা আছেন দেবুদাও বলবেন, যে আমার অভিজ্ঞতা সেটা বলছি, কলকাতার প্রফেশনাল, পেশাদারী থিয়েটারে কলকাতার লোকেরা feed করে না, এটা feed করে কিন্তু মফস্সল দর্শক। এখন, মফস্সল দর্শক, আপনি আমায় বলুন, যে পয়সা খরচা করে জ্ঞান নিতে কেন আসবে? হ্যাঁ, আমি যদি স্টেজে দাঁড়িয়ে – কি বলব - একটা অঙ্ক কষাই বোর্ডে, পাবলিক কেন আসবে? পয়সা নিয়ে কেন দেখতে আসবে? যেমন, আমি দেখেছি, গাঁয়ের দর্শকদের, ওঁরা খুব সোজা দর্শক কিন্তু। ওরা হয় খারাপ বলে, নয় ভালো বলে। মোটামুটি-হলেও হতে পারে – কি বা কেমন –অথচ - মধ্যবিত্ত বাঙালির মত বলে না। যেমন বলছি, আমরা পিংলাতে নাটক করে যখন বেরোচ্ছিলাম, তখন একটা লোক এসে বলল, আপনাদের বাসখানা যেমন চকচকে, আপনাদের গাওনাটাও তেমন চকচকে। কথাটার এখন ব্যাখ্যা যদি করি, চকচকে মানে? চকচকে হচ্ছে slick। ইংরাজিতে slick। slick বললে তুমি বুঝতে, চকচকে বললে বুঝবে না। ও কিন্তু বলল, তোমরা কোনও খিমে নেই। পুরো জিনিসটা চকচকে লাগল। যাত্রাও দেখুন আপনি, আমি দেখেছি যাত্রাতে, অনেক ভুল আছে যাত্রাতে, যাত্রাতে ওরা ক্রুড এ্যাক্টিং করে, গলা peculiar করে, ডেলিভারি ভুল করে, সব –কিন্তু থামে না। যাত্রাতে দেখবেন ওদের যেটা চলে পুরো ব্যাপারটা –থেমে নেই কোথাও। আমরা খুব ভালোভাবে অনেক গ্রুপ থিয়েটারে অ্যাক্টিং করি, আমি এমনও দেখেছি, হাঁটতে গিয়ে সেটে ধাক্কা খেয়ে যাচ্ছে, সেট পড়ে যাচ্ছে। কিংবা উচ্চারণ দুষ্ট। কিংবা anticipated dialogue বলছে, বা উইংসের দিকে তাকাচ্ছে। এটা কিন্তু এখনও আকছার দেখা যায়। এটা আপনি যাত্রায় কোনদিন পাবেন না। কেন পাবেন না আমি বলছি। ওটা যদি করে, ওরা কিন্তু এক নিমেষে লোককে নামিয়ে দেবে। ওরা নগদ বিদায়ের জন্য এসেছে। ওরা শৌখিনতার জন্যে আসেনি। সারা বছরে দশটাকা জমিয়ে সন্ধেবেলা যখন এসেছি, তাহলে পুরোপুরি নিয়ে বাড়ি যাব। সোজাসুজি বলবে, খুব ভালো নয় তো, দুর, কিছুই হলো না, বন্ধ করে দিন। যেমন, একজন অভিনেতাকে বলেছি, আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের কোন একটি ছেলে, যাত্রায় গেছিল। তারপরের দিন সকালে, গাঁয়ের বৃদ্ধ লোক ডেকে পরিষ্কার বলেছিল যে, "অন্য কিছু করলে হয় না?" সে বললে, "আজ্ঞে?" সে খুব চিন্তাবিদ ছেলে। চিন্তা টিন্তা কলকাতায় করেছে। তা এখন সুদূর বাংলাদেশে এত রকমের গ্রাম আছে, আমরা অনেকেই তো জানি না সেগুলো, তাই সে বলছে, "আজ্ঞে, অন্য কিছু মানে?"

"বলে, "মাটিকাটা, ধানকাটা- মানে যেটা করছেন, সেটা আপনার আসে না। কার কোনটা আসে এটা কিন্তু আমাদের সাধারণ দর্শক যারা ভয়ঙ্কর ভালো বোঝে। পরিষ্কার বললে, আপনি যেটা করছেন সেটা আপনার আসেনা, তা অন্য কিছু করলে হয় না? সময় কেন নষ্ট করছেন?" তা আমার অভিজ্ঞতা ওইটেই যে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে - কালকেই একটি ছেলে, সায়কের, আমাকে বলল, আমার বহুদিনের ইচ্ছে যে আমি 'নীচের মহল'টা রিভাইভ করি। কারণ 'নীচের মহল'টা আমাদের হয়নি। উৎপলদা ফেল করেছিলেন 'নীচের মহল' করতে গিয়ে। 'নীচের মহল' পরে আমি কুরোসাওয়ার প্রোডাকশান দেখেছি। তারপরে Renoir ছবি দেখেছি। আমি যখন পড়েছি, স্তানিস্লাভস্কির প্রোডাকশানটা সম্বন্ধে, তারপরে কমল মজুমদার,[xxxiv] বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, "কিছুই হয়নি। তোমরা গোর্কী বুঝতে পারোনি। তোমাদের দোষ না, গোর্কী বুঝতে পারোনি পড়ে"। তা এতদিন পরে জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করে- খুব ইচ্ছে ছিল 'নীচের মহল' করব। করতে করতে থেমে গেছি। ও বলল, "নীচের মহল" করছেন না কেন?" আমি বললুম,"নীচের মহল করব কোথায়?" বলল, "এইখানে, বেস্পতি-শনি-রবি"। আমি বললুম, "ওতো প্রফেশনাল পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জায়গা। ওখানে দর্শক বৌ-টৌ নিয়ে আসে থিয়েটার দেখতে –বিকেলটা ভাল কাটবে বলে। আমি বললুম, "তুমি ঠিক বলেছো, তোমার বয়সে আমিও ওই চিন্তাই করতাম। আমি এখন চিন্তা করতে পারছিনা। হ্যাঁ, করবো। তুমি থিয়েটার ইউনিট [xxxv]কে বলো একলাখ টাকা আমার জন্যে নষ্ট করবে, 'নীচের মহল' কেন, তার চেয়ে অনেক এক্সপেরিমেন্টাল নাটক নামাতে পারি। ওদের বল যে একলক্ষ টাকা আমার জন্য ওরা নষ্ট করবে। তখন বলছে, "না"। আমি বললুম, "দেখ, তুমি ছেলেমানুষ, পাগলামি কোরো না। এখানে পয়সাটা না এলে কিন্তু বাড়ি-ঘরদোর বিকিয়ে যাবে। এটা তো পরীক্ষা-নিরীক্ষার জায়গা নয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, আমরা যেহেতু গ্রুপ থিয়েটার থেকে এসেছি, জ্ঞানেশ, আমি, আমরা – যেমন আমার জ্ঞানবুদ্ধি কতটুকুই আর, আমি যেমন মেয়েদেরকে বলেছিলাম, "ভাই, তোমরা হাতকাটা ব্লাউজও কেউ পোরো না। পাশেই 'রঙ্গিনী' চলছে বলে আমার ক্রোধ আছে। আমি পাশেই করব কমেডি। কোন বক্স অফিস না নিয়ে। কেবল আমি থাকব, শেখর থাকবে, আর বাসবী থাকবে। মেয়েদেরকে বলেছিলাম, "তোমরা যদি পার হাতাওয়ালা ব্লাউজ-টাউজ পোরো। কারণ, ওই অপসংস্কৃতির কোন পয়েন্টেই যেন আমরা – তাকে রুখতে না পারি, তাকে হেল্প যেন না করি। পরেনি এবং চলছে, প্রচণ্ড ভাবে চলছে। বোঝা যাচ্ছে, দর্শকের যদি ভাল লাগে, মনোরঞ্জন, যেটা বাংলা কথায় বলি আমরা, যদি মনোরঞ্জন হয়, সেখানে যদি এক্সপেরিমেন্টাল কিছু করে মনোরঞ্জন হয়, নিশ্চয়ই সেরকম কিছু করিনি আমরা, করতে ভরসা পাইনি, এইটিই অভিজ্ঞতা। আর তো অন্য কিছু করার মত ভরসা পাইনি। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যে 'নীচের মহল' যদি নামাই আজকে, আমি কিন্তু শিওর কেউ আসবে না। তবে আমি জানি না, আসতেও পারে। কারণ, এখন তো রবি ঘোষের নাম হয়েছে। সেটা দেখবার জন্যেও আসতে পারে। 'চলাচল' নাটক আমি বন্ধ করেছিলাম ঐ একটাই কারণে। দেখতাম বাইরে থেকে সমস্ত আসত অর্গানাইজেশন, এসে বলতো যে, "আপনি পার্ট করবেন তো?" এই রাগেই বন্ধ করে দিলাম। আপনি তো 'চলাচল' দেখতে এসেছেন, আমি করি বা না করি, it is not a factor। আমি পরিচালনা করেছি। না, আপনি যদি করেন! ও তাহলে ব্যবসা হচ্ছে! তাহলে গ্রুপ থিয়েটারের activities কোথায় হচ্ছে? আমি বললুম, "তবে বন্ধ করো let me be professional, পেশাদার হওয়া better। এই আমার থার্ড নাটক চলছে, কতদিন করবো জানি না, তবে সুস্থভাবে–আমি প্ল্যানই করেছি কমেডি ছাড়া আর কিছু আমি করব না। নানান ধরনের কমেডি আমি করব, কারণ ওইটে আমি স্পেশালাইজ করলে আমার মনেও ভাল লাগবে আর জুনিয়র যদি কেউ আসে তারও ভাল লাগবে। কারণ, এটা একটা ফর্ম, এটাতে স্পেশালাইজ করা উচিত। আমাদের এখানে ভাঁড়ামো করে কমেডিটা হয়। সেটা avoid করে সিচুয়েশনাল কমেডি যেটাকে

বলে, সেটাকে generally কিন্তু অডিয়েন্স নেয়। আমাকে কেউ যদি বলে নেয় না, আমি কিন্তু মানব না, আমি করে এসেছি। ছদ্মবেশী, ভয়ঙ্করী –আমি interior গাঁয়ে গিয়ে যাত্রা ফর্মে করে এসেছি এবং যে কলকাতার হলে রোজ পাই, বরং তার চাইতে বেশি রি-এ্যাকশান আমরা পেয়েছিলাম। এইটে আমার অভিজ্ঞতা।

<u>পবিত্র সরকার</u>

শ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত আমাদের মধ্যে এসেছেন। জ্ঞানেশবাবু এবং রবিবাবুর কথা থেকে যে ব্যাপারটা বেরিয়ে এল, যে, সুস্থ এক ধরনের প্রমোদ যদি তৈরী করা যায়, সাধারণ বাঙালি দর্শক সেটা নেয়। শ্রী দেবনারায়ণ গুপ্ত দীর্ঘদিন ধরে অনেক রকম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটা সুস্থ প্রমোদ তৈরী করবার চেষ্টা করেছেন আমরা জানি। বিশেষ করে বাঙালির পারিবারিক যে সমস্ত মূল্যবোধ আছে, সেইগুলোই তার নাটক। তিনি যে adopt করেছেন, কখনও নিজে নাটক তৈরী করেছেন, তাঁর নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। এখন যে অবস্থাটা খুব গোলমেলে হয়ে গেছে, cabaret চলছে, এ চলছে, তার মধ্যে উনি কিভাবে সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন, সেটা বাইরে থেকে আমরা জানি না। এইটেই হচ্ছে সুযোগ, তাঁকে জিজ্ঞেস করব যে, তাঁর মতো করে নাটক করার কি অসুবিধে হচ্ছে, হলো এবং কেন তিনি আস্তে আস্তে চলে গেলেন এখান থেকে। এইটে মনে হয় তাঁর জীবনে নাটক করার অভিজ্ঞতা থেকে এখন পর্যন্ত তাঁর সমস্যাগুলোর কথা আমরা শুনতে চাই তাঁর কাছ থেকে।

<u>দেবনারায়ণ গুপ্ত</u>

যে কথা আপনারা শুনতে চাইছেন আমার কাছ থেকে তার আগে রবি কিছু কিছু কথা বলেছেন। সমস্যা অনেক রকম। একটু যদি পেছিয়ে বলা যায়, আপনাদের বোধহয় সুবিধে হবে – মানে আজকের সঙ্গে সেদিনের। আমি ১৯৪৪ সালে খবরের কাগজ থেকে যখন থিয়েটারে এলাম, তখন সব থিয়েটারগুলো ধার-দেনায় জর্জরিত। কিন্তু তথাপি তাদের নাটক অভিনয় করা স্তব্ধ হয়ে যায় নি। তারা নাটক করছেন, শুধু সামাজিক নয়, সামাজিক, পৌরাণিক, হাসির নাটক, অপেরাধর্মী নাটক এবং নাটকের ক্ষেত্রে যত রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়, তখনও কিন্তু তা চলছে এবং সেই দুর্দিনে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। যদি তিনি এইভাবে নাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করতেন তাহলে বোধহয় তাঁর শ্রীরঙ্গম[xxxvi] বেঁচে থাকত। সবচেয়ে দুঃখের কথা হল যে, শিশিরবাবু তাঁর শ্রীরঙ্গম ধরে রাখতে পারলেন না। অত বড় প্রতিভাবান মানুষ, কেন পারেন নি? না, তিনি কতকগুলো ব্যাপারে আপোষ করতে চাইতেন না। আবার

কতকগুলো ব্যাপারে তিনি discard-ও করতেন। যেমন, আপনাকে আমি বলছি, আজকে ব্রেখট নিয়ে অনেক মাতামাতি হচ্ছে। ১৯৪৫ সালে শিশিরবাবুর টেবিলে আমি ব্রেখটের নাটক দেখেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম - ছাপার ফর্ম তো আলাদা - নাট্যাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এটা কার লেখা নাটক? উচ্চারণটা ঠিক আমার দ্বারা হচ্ছিল না। বললেন, "দেখ, এটা জার্মান নাট্যকার, ব্রেখট, এরকমভাবে last revolution-এর সময় সে বেচারী ঘুরে ঘুরে লিখেছে"। আমি বললাম, "কী রকম লেখা?" বললেন, "অত্যন্ত সুন্দর লেখা"। তা আমি বললাম, "এর থেকে কি কিছু করবার পরিকল্পনা আছে আপনার?" বললেন, "রামশ্চন্দ্র! খেপেছো তুমি? অন্যদেশের মহান সৃষ্টি হলেই যে সেটা আমাদের দেশকাল আর মাটির সঙ্গে মিশবে এমন কোন কথা নেই। এ কাজ আমি কক্ষনো করব না। মহান সৃষ্টি আমি স্বীকার করছি, কিন্তু আমার দেশের উপযোগী এ কথা আমি স্বীকার করতে রাজি নই। আর যে যোগসাযুজ্যের কথা উনি বলছেন নাটকে, ওটা nothing new to us। ওটা আমরা যাত্রায় বহুকাল ধরে করে এসেছি"। এক কথায় উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি যখন বললাম, "আপনি তো 'পরিচয়' করলেন, 'চিঠি' করলেন, পরপর নাটকগুলো মার খাচ্ছে, কিন্তু আবার তো আপনি মঞ্চস্থ করতে চলেছেন এতবড় একটা নাটক, 'তখৎ-এ–তাউস'[xxxvii]। উনি বললেন, "দ্যাখো, এ বইটা বহুকাল ধরে প্রেমাঙ্কুর আমার কাছে লিখে দিয়েছে, এবং আমার অনেকদিনের ইচ্ছা এইটেই আমার শেষ অথবা এতেই আমি উঠবো। practically শেষই। তখন তাঁর প্রোডাকশান করবার ক্ষমতা নেই। এর পাশে আর একটি থিয়েটার তখন তিনি চালাচ্ছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,[xxxviii] ছিলেন অভিনেতা, by the grace of God, তিনি ১১ বছর কাল রঙমহল থিয়েটারে lessee ছিলেন। তিনি শূন্য হাতে এসেছিলেন, বহু পয়সা এক এক নাটকে পেয়েছেন। আবার এক এক নাটকে প্রচুর খরচ করেছেন। মনে রাখতে হবে, সেদিন কিন্তু আজকের মতন একটা নাটক সমগ্র সপ্তাহ চলত না। তখন বুধবারে অভিনয় হত একটা নাটক, বৃহস্পতিবারে অভিনয় হত একটা নাটক, শনি-রবিবারে অভিনয় হত আর একটা নাটক। শনিবারে ডবল শো ছিল না, একটাই শো ছিল এবং রোববারে দুটো শো ছিল। তার জন্যে তখন প্রত্যেকদিন তখন একটা অভিনয় শেখানোর জন্য আমাদের একটা রিহার্সাল রোজই হত। আজকে পৌরাণিক নাটকের অভিনয় হচ্ছে, রিহার্সাল হচ্ছে। কালকে ঐতিহাসিক নাটক, তারপরের দিন সামাজিক নাটক আর শিশিরকুমারের কাছে যারা যেতেন, অর্থের জন্য যেতেন না, তাঁর কাছে শিক্ষা করবার জন্য যেতেন। আমি জানি, দুটি শিল্পীর কথা এখানে উল্লেখ করলে বোধহয় অন্যায় হবে না, একজন অনুপকুমার[xxxix], অপরজন কমল মিত্র [xl]। তখন তাঁরা যা হোক কিছু টাকা পান। তিনি forego করলেন শিশিরবাবুর কাছে শেখবার জন্যে। এই দুজন এবং বলা ছিল তোমার গাড়িতে তেল যা লাগে আমি দেব কমলকে। কিন্তু গাড়ির তেলের দামও দিতে পারেন নি। তাতে তার কোন ক্ষোভ নেই। তাতে অনুপেরও কিছু ক্ষোভ নেই কারণ, শিক্ষা করতেই তারা গিয়েছিল। একেকটি ইনস্টিটিউট। এখানে রঙমহলে তেমনি অহীন্দ্রবাবু[xli] ছিলেন। তাঁর কাছে শেখবার জন্যে তখন একটা schooling ছিল পাবলিক থিয়েটারে। সেটা এখন একেবারে উঠে গেছে। কিভাবে নাটক করা হত? না, সব ধার-দেনা করে। যখন দেনার টুপিটি মাউন্ট এভারেস্টে উঠে গেছে, তখনও পর্যন্ত কিন্তু নাটক প্রযোজনা স্তব্ধ হয়নি। একদিনের কথা বলছি, যে ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে, তারাশঙ্করবাবুর 'বিংশ শতাব্দী'[xlii] নাটক মঞ্চস্থ হবে - আমি বলতে পারি তারাশঙ্করবাবু যত নাটক লিখেছেন তার মধ্যে 'বিংশ শতাব্দী' একটি উল্লেখযোগ্য এবং খুব সুন্দর একটি নাটক, সুরচিত নাটক এবং সুসংবদ্ধ নাটক। এই নাটকের রিহার্সাল হলো - দু'টি মুখ্য ভুমিকায় অভিনয় করতেন অহীন্দ্রবাবু এবং শান্তি গুপ্তা[xliii]। অহীন্দ্রবাবু যে পার্টটি করতেন তার নাম ছিল 'ডক্টর শাস্ত্রী'। শাস্ত্রী একজন বৈজ্ঞানিক, এবং তিনি একদিন রিহার্সালের সময় একদিন একটি প্ল্যান তৈরী করে নিয়ে এসে এবং খুঁটিনাটি করে উনি শরৎবাবুর কাছে তুলে দিলেন যে, দ্যাখো, ডাক্তার শাস্ত্রীর ল্যাবরেটরিটা এইভাবে সাজাবে –সেখানে একটা

কলেজ ল্যাবরেটরির চেয়ে বোধহয় কোনো অংশে খারাপ নয় বরং কিছু বেশী। খাঁচায় কতকগুলো গিনিপিগ, এখানে কতকগুলো বিলিতি ইঁদুর, ওখানে কতকগুলো পায়রা, নানা জীবজন্তু সব খাঁচার ভেতরে এবং তার সঙ্গে ল্যাবরেটরিটি সাজাত। total production cost এবং সীন তৈরী নিয়ে তখনকারের দিনে খরচ পড়েছিল বিশ হাজার টাকা। আমরা খুব আশা করেছিলুম নাটকটি চলবে। তখন চলেনি। আজ এখানে রবি আছেন, ওখানে জ্ঞানেশভাই আছেন, আমি তাদের বলছি যে, সেদিন বোধহয় too early ছিল আমাদের কাছে, দর্শকের কাছে।

এখন এরা নাড়াচাড়া করে দেখতে পারেন বইটা করা যায় কি না। কারণ, এখন যারা বই করছেন, তাদের ওপর আমি নির্বাচনের জন্যে একটা অনুরোধ জানাচ্ছি। কিন্তু বইতো তিনদিন চললো। ফলে একেবারে রঙমহল থিয়েটার ডুম। একদিন সকালবেলা, গাড়ি তো -ঘোড়ারগাড়ি ছিল সব থিয়েটারে, কারুর দু'খানা গাড়ি, কারুর তিনখানা গাড়ি, মেয়েদের আনবার জন্যে। ঘোড়ার গাড়িটি একেবারে আমার বাড়িতে এসে হাজির। শরৎ চাটুজ্জের একখানি চিঠি, তুমি এক্ষুণি এই গাড়িতে চলে এস। গেলুম। আমার অফিস আছে, খাওয়াও হয়নি, যেতেই আমাকে বললেন যে, তখন 'ভারতবর্ষে' আমি কাজ করি, যেতেই আমাকে বললেন যে, "ভাই, এক্ষুণি তোমায় বেরোতে হবে আমার সঙ্গে"। "কেন?" না, " বইতো ১৫ দিনের ভেতর না তুললে আমার বাঁচবার কোন উপায় নেই। আমি তো ডুবেই গেছি। আমি বললুম, "কি বই করবেন?" তো বললেন যে, "সবাই বলছে যে উপেন গাঙ্গুলীর 'রাজপথ'[xliv]। আমি বললুম, "রাজপথ' করবেন? আচ্ছা দেখি।" তারপরে বললেন, "এক্ষুণি চল আমার সাথে।" উপেনদা থাকতেন বালিগঞ্জ প্লেসে। তাঁর বাড়িতে তো গেলুম। গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ফাইনাল করে আমি চলে এলুম। নাটকটার বই একখানা কিনে নিয়ে, যাবার সময় বাজার থেকে কিনে নিয়ে পড়তে পড়তে গাড়িতে যাচ্ছি, ইতিমধ্যে শরৎদা, সেদিন মাসের দশ তারিখ, গাড়ি শরৎদা এক এক জায়গায় গাড়ি ঢুকছে, কোন কোন জায়গায় গ্যারেজে ঢুকছে, উনি ওপরে উঠছেন, আমি বসে বসে বই পড়ছি। কখনো বা একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেলেন, গাড়িটা রেখে, আমি সেখানে বসে বসে বই পড়ছি, খানিকবাদে আবার চলে এলেন। এসপ্ল্যানেডে কোন এক জায়গায় রেস্টুরেন্টে খেলেন, খেয়ে আবার সেখান থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন হাইকোর্ট পাড়ায়। বললেন যে, attorney সঙ্গে দরকার আছে। বসে আছি attorney অফিসে। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময়, আমিও টায়ার্ড, বললাম, "এত ঘুরলেন, কি ব্যাপার?" বললেন, "আজ মাইনে দেবার দিন।" আমাদের বলা হত, 'সাজাহান'[xlv] হলেই আড়াই হাজার টাকার বিক্রি হবেই –একটা ব্ল্যাংক চেক বলা হত। একটা terms ছিল, ওই ১০ তারিখে ব্ল্যাংক চেকটা দিত। অর্থাৎ কিছু টাকা পাওয়া যাবে এবং মাইনের সুবিধা হবে। কত কষ্ট, আপনারা ভেবে দেখুন। আজকে এ কথা তো আপনারা কেউ জানেনই না, কি কষ্ট করে চলেছে। তারপরে এল, এসেই আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে

ওপরে উঠেই, সন্তোষবাবু, আমাদের ম্যানেজার ছিলেন, তাকে দেখেই বললেন, "কত টাকার বিক্রি?" সে বলল, "ছাব্বিশশো টাকা।" "দেখ দিকিনি, আর কতহল?" পাঞ্জাবীর এ পকেট ও পকেট থেকে নানারকম টাকা বের করল, তার মধ্যে খুচরো, রেজগি কিছু বাদ নেই! হাজার ছয়েক টাকা। আমাকে বললে, "কেন ঘুরলাম জানো তোমাকে বসিয়ে রেখে? এই ছ'হাজার টাকার জন্যে। ধার করতে, হ্যান্ডনোটে। কোথাও হ্যান্ডনোট দিয়ে, কোথাও এমনি নিয়ে এলাম –এইভাবে ছ'হাজার টাকা। মাইনেটা তো দিতে হবে। আমি সেই ১০ তারিখ হলেই দেখতাম, দুটো কাবলেওয়ালা, ওই রঙমহল থিয়েটারের সামনে, সে যেন মিলিটারির মত টহল দিচ্ছে। আমি জানি যে এরা দেড়মাস দুমাস মাইনে পায়নি। ওদের কাছে টাকা নিয়েছে আর ওদের চুনোট করা পাঞ্জাবী, হাতে সিগারেট, মুখে জর্দার ভুরভুরে গন্ধ, এই নিয়ে তারা ঢোকবার জন্য, দর্শক তাদের দেখবার জন্য বসে আছে। অথচ আমি জানি এদের কি অবস্থা ভিতরে। আমার ধারণা, এই যে আজ মাইনেটি পাবে আদ্ধেকটি ওই কাবলেদের হাতে দিয়ে বাড়ি যেতে হবে বাকি পয়সা নিয়ে। এই করে থিয়েটার চলছে। 'রাজপথ' চলল আবার কিছুদিন। যাই হোক, এমনি করেই থিয়েটার সেদিন চলেছে, সেই '৪৪ সাল থেকে। কিন্তু '৪৭ সাল থেকে '৫২ সাল পর্যন্ত বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের অত্যন্ত দুর্দিন। আপনারা বলবেন, স্বাধীনতার পর এত দুর্দিন গেল কেন? আপনারাই হিসেব করে দেখুন এই '৪৭ থেকে '৫২র ভিতর শিশিরবাবু চলে গেলেন থিয়েটার ছেড়ে, রঙমহলের হাতবদল হল। মিনার্ভা থিয়েটারের হাত বদল হল, স্টার থিয়েটার [xlvi] বন্ধ হয়ে গেল। স্টার থিয়েটার ছ'মাস বন্ধ রেখে, নতুন করে একটু রি-মডেল করে নিয়ে সেখানে নতুন করে 'শ্যামলী' নাটক নামানো হল। 'শ্যামলী' নাটকে দেখে গেল অত্যন্ত দর্শক। প্রচুর দর্শক এখন। কেবলমাত্র অপরিচ্ছন্ন এই নাট্যশালা, ততোধিক অপরিচ্ছন্ন এর দৃশ্যসজ্জা, ততোধিক অপরিচ্ছন্ন এদের বেশভুষা, এবং সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর হচ্ছে এর দর্শকের আসন। আমি এখনও জানি যে, রঙমহল থিয়েটারে হাজার টাকার বেনারসী সাত টাকার সিটে বসে ছিঁড়ে গেছে। এসে দেখিয়েছেন ওপরে –দেখুন সাত টাকার সিটে বসে হাজার টাকার বেনারসীর কি দশা! আপনারা এগুলো লক্ষ্য করতে পারেন না মাঝেমধ্যে? এই করে সাধারণ রঙ্গালয় আজও বেঁচে আছে। বেঁচে থাকলেও আমরা গালাগালি সাধারণ রঙ্গালয়কে – একদিক থেকে আজও শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয় এ দেশের অরিজিন, এ কথা ভুললে চলবে না। কি শ্রম! কি সাধনা! কি কষ্ট! সে যদি অমৃতলালের 'আত্মস্মৃতি' পড়েন আপনারা, বুঝতে পারবেন। আপনারা যদি গিরিশচন্দ্রের খেদের কথা শোনেন, বুঝতে পারবেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের[xlvii] যা অল্পস্বল্প লেখা আছে, বুঝতে পারবেন। বিনোদিনীর আত্মকথা পড়ুন বুঝতে পারবেন। একজন বিশিষ্ট অভিনেতা, এবং খুবই নাম তাঁর, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, "আমাদের এসব কথা আপনি কোথায় পান?" আমি বলেছিলাম যে, "ইতস্তত এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আপনারা খুঁজে নিলেই পাবেন। বাইরের বইয়ের খবর রাখেন, এদেশের খবর রাখেন না।" এই করে বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় একশো বছর অতিক্রান্ত হলো। তার একটা ইমেজ ছিল। সে সবরকম অভিনয় করতে পারত। তার নাটকগুলো দেখবেন, সেই যুগের বলিষ্ঠ নাটক। এতদিন বাদে উৎপলবাবুও সেটা স্বীকার করেছেন, গিরিশচন্দ্রের কথা। Anyhow, তাঁর সব কথা, তাঁর সঙ্গে - গিরিশচন্দ্রের যে সমস্ত লেখা, তার সঙ্গে আমি কোন কোন জায়গায় হয়তো একমতও নই। কিন্তু তথাপি আমি বলব যে, একজন talented এ যুগের, বিশেষ করে উৎপলবাবুর মত শিল্পী, তিনিও গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে এ কথা বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ nausea আছে যাদের, তাদেরও বলছি, তিনি সেই রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে কি বলেছেন তাঁর 'গিরিশ মানসে' সেটাও তাঁদের পড়তে হবে। আজকে যে একশো বছর হয়ে গেল, এই একশো বছর কত সংগ্রাম করে গেছি '৪৪ সাল থেকে আর '৫২সাল পর্যন্ত। বিশেষ করে স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' খোলার পর দেখা গেল যে, অসংখ্য দর্শক ভালো, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে দেখতে পারে এমন, দৃশ্যপট নতুন। সলিলবাবু তখন

বলেছিলেন তাঁর অনেক কিছু সঞ্চয় লস করেছেন তা সত্ত্বেও এই ঘোড়া আমার ছোটে ছুটুক আর তারপরেও আমার বাড়িখানা আছে সেটাও আমি দেব। এ কথা তিনি বলেছিলেন এবং তিনি tons of money রোজগার করে গেছেন পাবলিক থিয়েটার থেকে, সুস্থ সবল নাটক দিয়ে রোজগার যে করা যায় - তিনি এখনও বেঁচে আছেন - তিনি দেখিয়ে গেছেন তাঁর বিত্তসম্পদের যা কিছু এবং দিয়েছেনও তিনি দুহাতে মানুষকে। সে ধারণা করতে পারবেন না। আজকে অন্তত ২০ হাজার টাকা বা তারও বেশী তিনি ডোনেট করে গেছেন। যে যখন এসেছে, যার জন্যে এসেছে, তাকে দিয়েছেন ভালো কাজের জন্য। প্রত্যেকটি হান্ড্রেড নাইটসে শিল্পীদের সোনাদানা দেওয়া, এই যে বোনাস দেওয়া আজকে হয়েছে, এর প্রচলনও তিনি করেন। এই যে প্রাইজের প্রচলন –সবই তিনি করে গেছেন। কিন্তু নাট্যশালার চরিত্র বদলে গেল এই একশো বছরে। যে চরিত্র নাটকের চরিত্র বদলালো, অভিনয়ের চরিত্র বদলালো, দৃশ্যপটের চরিত্র বদলালো এবং অনুপ্রবেশ ঘটল চলচ্চিত্রের, সিনেমার টেকনিক অনুপ্রবেশ ঘটেছে বাংলার নাট্যশালায়, এটার চেয়ে বড় চরিত্রহনন আর বোধহয় হতে পারে না। যার প্রতি আমার অত্যন্ত ক্ষোভ। যাঁরা গ্রুপ থিয়েটার করছেন, তাঁদের সীমিত ক্ষমতা। তাঁরা একটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে এখানে ওখানে গিয়ে করতে পারেন। তাঁদের হালকা সেট কিছু ইয়েটিয়ে দিয়ে করতে হতে পারে - কারণ, তাঁরা আজ এখানে কাল ওখানে গিয়ে করছেন। কতরকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যে করছেন। কিন্তু পাবলিক থিয়েটার তো তা নয়। তারা সেই ইমেজ কেন মেনটেন করে চলছে না? আজ এক দশকের ওপর হতে চলল, একটা ওরিজিনাল, মৌলিক নাটক বাংলা নাট্যশালায় অভিনয় হয় নি। শেষ অভিনয় করে এসেছি আমি –'বিদ্রোহী নায়ক'। তারপরে আর একটিও অরিজিনাল নাটক -কেবলমাত্র নাট্যরূপ -নাট্যরূপ -নাট্যরূপ। নাট্যরূপ আমি অসংখ্য দিয়েছি। শরৎবাবুর দিয়েছি, উপেনবাবুর দিয়েছি, প্রবোধ সান্যালের[xlviii] দিয়েছি, সুবোধ ঘোষের[xlix] দিয়েছি, তারাশঙ্করবাবুর দিয়েছি, বিমল মিত্তিরের[l] দিয়েছি, অনেকের দিয়েছি। কিন্তু তখন ছিল দুর্দিন, বাঁচবার প্রশ্ন। কিন্তু যখন বেঁচে উঠলাম আমি তারপর থেকে আমি অরিজিনাল ছাড়া কোন নাটকই লিখিনি যে কদিন ছিলাম স্টার থিয়েটারে। কিন্তু আজ সে অসংখ্য দর্শক। খরচ অবশ্য খুব বেড়েছে। বিজ্ঞাপন দিতে গেলে সে অনেক ব্যাপার। কিন্তু এই যে টেপ রেকর্ডার এবং যে সঙ্গীতশিল্পী গাইতে পারে তাকে দিয়েও ঠোঁট নাড়ান এটা কুত্রাপি কোন সভ্য দেশের থিয়েটারে আজও হয় না। সামনে থাকে music hands। এখানে মিউজিক আমরা কিনি। এসব ঢুকল। কালকের টেলিগ্রাফে একজন বলেছেন যে ডি এল রায়, গিরিশচন্দ্রের নাটকেও তো নাচ ছিল। সখীরা নাচত। গিরিশচন্দ্র,[li] ডি এল রায় কি ক্ষীরোদপ্রসাদের [lii] 'আলিবাবা'[liii] য় কিম্বা 'কিন্নরী' তে ক্ষীরোদপ্রসাদের - নাচ ছিল। সেই নাচ কি নাচ? সেটা বুঝলেন না? নাচ ছিল? তারই সাপোর্টে বলা হচ্ছে যে, এই ক্যাবারে নৃত্য। আজকে থিয়েটারের অনেক সমস্যা। এদিকে গভর্নমেন্ট বলছেন আমি exempt করে দিলাম। কর্পোরেশন বললেন পার শো ৪০০ টাকা দিন। দুটোই controversial। পার শো ৪০০ টাকা দিতে হবে। কেন? আমি তো জানি দশ টাকা ছিল প্রথমে। আমাদের লাইসেন্স চল্লিশ টাকা করে হয়েছিল যখন মেয়র ছিলেন আমাদের সতীশ ঘোষ। তখন শিশিরবাবু বললেন, "সতীশ, তুমি চল্লিশ টাকা করে দিলে আমাদের এই গরীব থিয়েটারগুলোকে?" খুব বন্ধু ছিলেন উনি। তো উনি হাসলেন। বললেন, "চল্লিশ এখন তোমরা দিতে পারবে।" ছিল চল্লিশ, তারপরে একশো টাকা হয়েছিল এবং whole নাইট করলে আর একশো টাকা দিতে হত। তখন whole নাইট হত। অর্থাৎ নবমীর দিন, জগদ্ধাত্রী পুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি। শিবরাত্রিতে হোল নাইট হত এবং আজকের আর একটা ট্রেন্ড যেটা উনি বলছিলেন 'ছদ্মবেশী'র কথা, এবং 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী'র কথা। আমার চোখের সামনে 'শ্রীমতী ভয়ঙ্করী' আমি দেখেছি। বাংলার মতো করে গল্পটা নিয়ে বাঙালির ছাঁদে করা। নির্মল আনন্দ। দেখে যেখানে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে দেখে বেরিয়ে আসছে। পাবলিক থিয়েটারে এইটে আমার একমাত্র অভিজ্ঞতা যেটা বলবার আছে। পাবলিক

থিয়েটারে এমন নাটক হওয়া দরকার যেখানে সামনের সারিতেই মনে রাখতে হবে হাইকোর্টের জজসাহেব বসবেন, কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বসবেন, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বসবেন এবং পেছনের সারিতে ঐ আলুওয়ালা, পটলওয়ালা - তাঁরা। তাঁরা যেন আনন্দে শিষ না দেন আর এঁরাও যেন লজ্জায় মাথা নীচু না করেন। এই দুটোর প্রতি লক্ষ্য রেখে পাবলিক থিয়েটারের বই করতে হবে -হাসির নাটক। হাসির নাটক তখনও হয়েছে, অমৃতলালের 'খাসদখল'[liv]–অদ্ভুত হাসির নাটক, 'ব্যাপিকা বিদায়'[lv] -অদ্ভুত হাসির নাটক এবং 'নবযৌবন'[lvi], আমি সেদিনও পড়ছিলাম। আজও যদি এগুলোকে রিভাইভ করা যায় আমার মনে হয় সে বই নিশ্চয়ই চলবে। কিন্তু আমরা খুঁজি না, দেখি না। আমরা adaptation করছি, কিম্বা আমরা translation করছি, আমরা আজকে শুধু পাবলিক থিয়েটারকে গালাগালিই দিচ্ছি। কিন্তু পাবলিক থিয়েটারের শ্রম ও সাধনা, তার বিগতদিনের ঐতিহ্য, তার সেই কষ্ট, কত কি করে সে ১০০ বছরে যখন পড়ল, তখন কয়েকজন মাত্র স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি তার চরিত্রহনন করল,পাবলিক থিয়েটারের। আজকে যে এই নাটকের চরিত্র বদলে গেল, পাবলিক থিয়েটারের কনভেনসন বদলে গেল, এইটে হচ্ছে সবচেয়ে বেদনার। কেউ কেউ বলেন, নাটক যে করব, শিল্পী কোথায়? কেউ কেউ যে বলছেন, তার মানে তাঁরা খুঁজছেন। শিল্পী সেইখান থেকেই যারা কিছু ছবিতে মুখ দেখিয়েছেন এবং যার কিছু বক্স অফিস হয়েছে। শিল্পী কোথায় –সেদিন সে প্রশ্ন ছিল না। শিল্পী তৈরী হত। শিশিরকুমার [lvii]কে আমি বলেছিলাম যে আপনি একটাও বক্স অফিস নিলেন না, আর্টিস্ট? আর আপনিও বড়দা চলে যাচ্ছেন, এ বইতে নামবেন না, এক মহর্ষি আর প্রভাদেবী[lviii] এই তো সম্বল। তার উত্তরে উনি বললেন, আমি বক্স নিই না, বক্স অফিস আমি তৈরী করি। আজ সে কথা কে বলতে পারে? যদি পারেন তাঁরা তা বলতে পারেন, তাহলে আমি বলব যে তাঁরা সেই তৈরী করুন। আর্টিস্ট তৈরী করে বই করুন। অনেক কষ্ট করে জাহানারার ওপর একটা বই লেখা হল। কিন্তু সেটা মঞ্চস্থ হবার কোন উপায় হোল না। ও চলবে না। কেন চলবে না? আজকের শিল্পীর যথার্থ বিচার হবে তখন, যে শিল্পী ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক সবরকম নাটকে অভিনয় করতে পারবে। কারণ প্রত্যেক নাটকের অভিনয় আলাদা। তার কালারফুল অভিনয় তখন অন্যরকম করতে হবে। আমাদের বাংলাদেশে আর একটা নাটক ছিল –seasonal drama। যখন চৈত্রমাসে আমরা সেটা করতাম শিবরাত্রে, পুজোর আগে করতাম আগমনী, তারপরে দোলের সময় করতাম দোললীলা ইত্যাদি ছোট ছোট seasonal drama। কই এখন তো সে আর নেই! আমি দেখেছি শিশিরকুমারকে সেখানে বসে আছেন, 'বসন্তলীলা' অভিনয় হচ্ছে, আমাদের পশুপতিদা সেখানে আবীরের ডিস হাতে করে তিনি অডিটোরিয়ামে নেমে এসে দর্শকদের কপালে ফোঁটা দিচ্ছেন। গান হচ্ছে। তার একটা আলাদা কনভেনশান। সেখানে ব্রেখটের কথা নেই, সেখানে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এবং বাঙালি দর্শক এবং বাংলার প্রকৃত ঐতিহ্যও সেইখানে। কই? আজকে সে বই কই? গাইয়ে একটা আর্টিস্ট নেই। যে গান গাইতে পারে তাকে দিয়েও ঠোঁট নাড়াচ্ছে। আর কি অনুপ্রবেশ করেছে? কথায় কথায় ফ্রিজ। ফ্রিজটা কিসের? পাবলিক থিয়েটারের? নাটকেতে ফ্রিজ নেই। ফ্রিজটা হচ্ছে সিনেমা থেকে। হাত উঁচু করে দাঁড়াল আর ফ্রিজ হয়ে গেল। ফোকাস থেকে আউট অফ ফোকাস ওইখানে হচ্ছে। আমি একজন পুরনো পন্ডিত বলতে পারি, চিত্রনাট্যের, সঙ্গীতের –ট্যাবলোই বলা হোক কিন্তু ফ্রিজ বলা হয়নি, নাটকে লেখা হচ্ছে 'ফ্রিজ', স্টেজ নাটকে। ফ্রিজটা কি? এখানে ক্যামেরা আছে যে ফ্রিজ করে দেবে? হাত তুলে দাঁড়াল আর ফ্রিজ হয়ে গেল। হোয়াট ইজ দিস? এ সমস্ত একেবারে এত বিচ্ছিরি ব্যাপার যে, যেগুলো আমাদের এখন, আমার পক্ষে অন্তত, ৭৩ বছর বয়সে আমার জ্বালা ধরেছে। আমি জ্বালায় বলছি আপনাদের কাছে এসব। একটা গান গাইবার লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। অহীন একদিন ক্ষোভের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন উনি বেঁচে, আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো রোজই সন্ধেবেলা থিয়েটারে থাক, আচ্ছা, অ্যামেচারে আজকাল শুনিচি প্লে হয় সাজাহান,

মহামায়াকে বাদ দিয়ে?" আমি বললাম, হ্যাঁ, দাদা, তাই হয়।" "কি করে হয়?" আমি বললাম, "ওই রকম করেই হচ্ছে।" "কেন গো? ঐসব নাটক তাহলে ওরা করে কেন?" আমি বললাম, "কেন হয় আপনাকে তাহলে আমি বলি। "সেথা গিয়াছেন তিনি, সমরে আনিতে জয়গৌরব জিনি"–এই গান গাইবার এতগুলো মেয়ে নেই, রাখেনি। সেখানে টেপে বাজায় তো! এতগুলো রাখেনি আর পায়ও নি। কাজে কাজেই ওখানে সেই ফিউরিয়াস অ্যাক্টিংও নেই। মহামায়া –যে এসেছে, ছদ্মবেশী কোন লোক, সে যশোবন্তসিংহ নয়। তাকে প্রাসাদে ঢুকতে দিও না। কি সাংঘাতিক দেশাত্মবোধক কথা। সে সমস্ত সিন বাদ। তবুও করতে হবে সাজাহান। কেন? নাই বা করলে। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে এই বই করবার জন্য? আর ধিনিক ধিনিক করে একটা মেয়ে এসে নাচছে –'আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে, নিয়ে এই হাসি-রূপ-গান' - কেন? পাঁচটা সখী ঠিক করতে পার না? আমি যখন থিয়েটারে এসেছি, চোদ্দটা, ষোলোটা–যে থিয়েটারে গেছি তখন একগাদা মেয়ে। সামাজিক বই যখন হয়েছে তারা বসে থেকেছে। তাদের ওই যে বুধবারে-বিষ্যুদবারে কাজ হত। সারাদিন রিহার্সাল হত। কত ঝঞ্ঝাট হয়েছে। তাই নিয়ে এক-একটা গল্প, সে যদি আপনারা শোনেন। যে মিউজিক ডিরেক্টর আর ডান্সিং ডিরেকটারের মারামারি কাটাকাটি -কি ব্যাপার? ফাটাফাটি হয়ে গেছে, এ ওর সঙ্গে কথা কইবে না। কি ব্যাপার? না গিয়ে শোনা গেল যে মিউজিক ডিরেক্টার বলেছেন, আমার গান ঠিক আছে, আর ডান্স যিনি দেখাচ্ছেন তিনি বলছেন আমার মেয়েদের পা ঠিক আছে। তা সবই যদি ঠিক আছে তবে কোনটা অসুবিধে হয়েছে দেখি, তা ডাকলেন। প্রোপ্রাইটর এলেন, দু'জনকেই চাই। মিউজিকও চাই, ড্যান্সিংও চাই। ডেকে বললেন, কি ব্যাপারটা কি? না, বেসুরা লাগছে। আমার সুরের সঙ্গে ওরা পা ফেলছে না। তা ডাকলেন, ডেকে বললেন, এদিকে আয় তো। মেয়েগুলোকে ডাকলেন, বল, গানের প্রথম লাইনটা। গানের প্রথম লাইনটা ছিল –ঘরে যাবনা, যাবনা, যাবনা লো। তা একটা মেয়ে গাইছে 'ঘরে যাবনা, যাবনা, যাব নোলা। তখন প্রোপ্রাইটর বললেন, "তোর নোলা'য় আগুন। আমার সর্বস্ব নষ্ট করছিলি তুই।" সেই মেয়েদের তৈরী করত, অথচ 'নো'লা' বলে ফেলত। সুরে ঠিক আছে, pronunciation –এ গণ্ডগোল। কাজেই এইসব ঝঞ্ঝাট রেখেও তখনকারের দিনে নাট্যশালা এইভাবেতে সেই সখী তুলে নিত। আজকে আমি বলছি যারা আমার দিন–my days are numbered, এখানে রবি আছেন, এখানে জ্ঞানেশ আছেন, বর্তমানে তাঁরা নাটক করে যাচ্ছেন এবং আরো নাটক তাঁরা করবেন। আমি তাদের বলছি, সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা নাটক থেকে একটু ঘুরে তাঁরা যান। আমার অনুরোধ পৌরাণিক করুন, ঐতিহাসিক, একটা কেটেকুটে গিরিশবাবুরই ধরুন। 'জনা'–আপনারা ভাবতে পারেন ফোর্থ অ্যাক্টে প্রবীর মারা যাচ্ছে, কিন্তু তারপরেও ফিফথ্ অ্যাক্ট চলছে? একটা হিরো মরে গেল, কত বড় নাট্যকার হলে তবে সেই নাটকটি সে ধরে রাখতে পারে? শিশিরবাবুর সঙ্গে যে শরৎচন্দ্রের বিবাদ হয়েছিল, 'বিজয়া' নিয়ে, প্রোডিউসার আছেন তো এক-একজন ওইরকম, প্রোডিউসার বললেই বলবেন আর্টিস্ট নেই। অথচ আমি জানি, গ্রুপ থিয়েটারে মাঝে মাঝে দেখি অভিনয়, অদ্ভুত আর্টিষ্ট! তাদের রিক্রুট করো! আমি এ কথাও বলছি যে এখন ফিল্মের গ্ল্যামার ছাড়া হবে না। গ্ল্যামার নিয়ে যদি কাজ হয়, সেই যুগের এখন আমি বলছি আছেন এখানে -আমাদের পশুপতিদা আছেন, আমিও ৩০-৪০ খানা অন্তত চিত্রনাট্য রচনা করেছি, খান চোদ্দ ছবিও পরিচালনা একসময় করেছি, কিন্তু আমি বলছি যে, সে যুগে আমাদের যে ছবি হত, সেগুলোতে মঞ্চের মানুষরাই অভিনয় করতেন এবং কতকটা মঞ্চ ঘেঁষা ছিল। তার স্পিডের অভাব ছিল। চলচ্চিত্রের যে ধর্ম, যে একটা ফুল লেংথ ছবিতে ওয়ান-থার্ড ডায়লগ থাকা চাই। less dialogue more action। আর এটা হচ্ছে more dialogue less action । এর কারণ হচ্ছে এই যে, একটা পারস্পেক্টিভ থেকে, একটা মুডকে আপনি ফেললেন - তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। সে সব জায়গা থেকে লোকেদের ছবিটা দেখছে। কিন্তু একজন শিল্পী যখন কাঁদছে, তখন সামনের সারির কয়েকজন তার চোখের জল দেখছে।

কাজেই তার সহ-অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে বোঝাতে হয় –"তুই কেন কাঁদছিস? এই রকম সংসার, এটা হয়ে থাকে" ইত্যাদি। তাকে ডায়লগ দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হয়। এটা sacred duty, এইটা হচ্ছে নাটকের ধর্ম। আজকের নাটকের ডায়ালগ কোথায়? "তুমি কেমন আছ?" আমি ভাল আছি।" এ কি ডায়লগ? "পশ্চিমে আরক্ত ভানু উদয়াচলে, হের ছায়া বিকশিয়া কায়া"– বলতে বললে দাঁড়িয়ে আর পারবে না। অর্থাৎ আবৃত্তির কাজ করেনি। আবৃত্তি সর্বশাস্ত্রাণাংবোধাদপিগরিয়সী। আবৃত্তিটাকে আগে আয়ত্ত করতে হয়। তারপরে অভিনয়। আবৃত্তিই করলাম না আমি জীবনে, অথচ আমি ছন্দ বুঝলাম না! অবশ্য নিশ্চয়ই বলছি আপনাদের কাছে যে আমাদের যে রবীন্দ্রভারতীতে বর্তমানে, এ সমস্তগুলো অত্যন্ত keen interest নিয়ে আপনি শিখে নিচ্ছেন। কিছু ছেলেমেয়ে সত্যিই ভালো অভিনয় উপযোগী হয়েছে এবং তারা frustrated হয়ে যাচ্ছে। পাবলিক থিয়েটার তাদের নিচ্ছে না। কাজেই এইগুলো থেকে এবং গ্রুপ থিয়েটার থেকে আমরা যদি যোগাড় করি, বলেন তাঁরা যে, - নাটক যে খুলব, শিল্পী কোথায়? এটা যখন বলবেন, তখন যাঁরা পরিচালক আছেন, রবি, জ্ঞানেশ তাঁরা তার প্রতিবাদ করবেন। করে বলবেন, শিল্পীর ভার আমার, প্রোডাকশানে খরচ করতে পারবেন কি না বল এবং এই আমার প্রোডাকশান। এটা যদি না করতে পারা যায়, বাংলার পাবলিক থিয়েটার বাঁচবে না। আজ দেখুন, চরিত্রগত ধর্ম বজায় রেখে, সেই পঞ্চাশ বছরে, ষাটের দশকেও যা ছিল না, সেই চিত্র আজকে বিশ্ব সভায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে –শিল্পজগতে, অভিনয়জগতে। আজকে থিয়েটার, একশো ন'বছর বয়েস যার চলছে, সে তার চরিত্রকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। এই চরিত্রহনন করা এবং চরিত্রটাকে নষ্ট করে ফেলা, এটা পাবলিক থিয়েটারে উচিত না এবং আপনারা দেখবেন, বিদেশেও পাবলিক থিয়েটারে ক্রমশ কালে কালে রূপের পরিবর্তন হবে, নিশ্চয়ই হবে। সেগুলোও আমরা নিশ্চয়ই নেব, এবং আপনারা দেখেছেন, শেক্সপিয়র থেকে ১৯২২ সালে আমরা ইবসেনে চলে এসেছি। নাটকের পরিধি কমে গেছে। অথচ, শেক্সপিয়র যুগে আমরা যে নাটক নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, সেই ধরনের নাটক এবং ১৯২১-২২ সালে শিশিরকুমার আসার পর থেকে নাটকের ফর্ম চেঞ্জ হয়েছে। আরও হয়ত চেঞ্জ হবে। হোক। কিন্তু তথাপি কেন হবে না এই সব ধরনের নাটক, এবং এই সব ধরনের নাটক এবং নানা রসের এবং নানান স্বাদের নাটক যদি অভিনয় না হয়, তাহলে আমরা শিল্পীকে যাচাই করব কি করে? একই ধরনের নাটক দেখতে দেখতে আসতেই হবে। আজ আমি প্রেডিক্ট করছি যে, বাংলার নাট্যশালায় এই ঘুরে ফিরে আসতেই হবে, নাহলে monotony brake কিছুতেই হবে না। monotony একদিন -এসে গেছে অলরেডি এবং আরো আসবে। যে কথা বলে যায় এবং এ কথা তোমরা শুনে রাখো রবি, এবং জ্ঞানেশকেও আমি বলছি যে যা বলে যায় এখন কার থিয়েটার দেখে, সে সব কথাগুলো সত্যি যদি তোমরা শোনো যে যাবার সময় আমি জীবনে যা দেখিনি যে কতগুলো স্কুটার, মোটরবাইকে দর্শক আসতে। স্বামী-স্ত্রী বা আর কাউকে নিয়ে তারা এলেন, থিয়েটার দেখলেন চলে গেলেন –এইসব কোথায় ভিড় হয়? তোমার থিয়েটারে নয়। সেইসব জায়গায় ভিড় হচ্ছে যেসব জায়গায় ডান্স আছে, ওই উদ্ভট নাচ আছে, সেইসব জায়গায়। কেন? এরকম তো দেখিনি। আমাদের তখন আসত - আজকে ডঃ রায় আসবেন, আজকে ১৫০ জন বিশিষ্ট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির লোক আসবেন। তার রিসেপশনের খরচও যথারীতি করেছেন স্টার থিয়েটারে থাকবার সময় বিদেশ থেকে কত ডেলিগেশান এসেছে এবং রাজভবন থেকে কত টেলিফোন আমাকে এ্যাটেন্ড করতে হয়েছে যে আজকে ১৫ জন লোক যাবে, আপনারা সিট রাখবেন,তবে আপনার সুবিধে হবে এরকম হবে ইত্যাদি। Sir John Casson, Cibil Thorndike এসেছেন। এসে শুনে যে কথা লিখে দিয়ে গেছেন তার ফটোগ্রাফ পর্যন্ত আছে। তিনি উত্তমের সঙ্গে শেকহ্যান্ড করছেন, সাবিত্রীর সঙ্গে শেকহ্যান্ড করছেন এবং বলছেন যে আমার ধারণা ছিল না যে বাংলাদেশের পাবলিক থিয়েটার এইভাবে –এত easy movement তার, এইভাবে তাঁরা অভিনয়

করতেজানেন, beyond our expectation, একটা depth - দাগ দিয়ে গেছেন যে সে কথা বলতে পারব না।একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশ যদি সৃষ্টি করা যায়, নাটক অভিনয়ের আগে একটা পরিবেশ লাগে, সে পরিবেশটা না হলে হয় না। পরিবেশটা কি? Theatre-এর একটা environment, auditorium environment সেটারও দরকার। আমি গত পরশুদিন রবীন্দ্রসদনে গেলাম। অত্যন্ত দুঃখের কথা, ঘেমে নেয়ে যাচ্ছি, অথচ সেখানে এয়ার-কন্ডিশন আছে। একটা প্ল্যান্ট চলছে কি চলছে না, এই যে অসুবিধে, অসাচ্ছন্দ্য, এতে কি করে আসবে? বাংলার থিয়েটার সেদিন যে ঋণগ্রস্ত হয়েছিল, অর্থের অভাবে, এ সবগুলো করতে পারত না। আজকে – তখন দর্শক আমরা দেখিনি –আজকে দর্শক প্রচুর হয়েছে কিন্তু কেউ কেউ ক্লেম করছেন যে দর্শক আমরাই তৈরী করেছি। আমি বললুম, ঠিক আছে, তোমরা উত্তমর্ণ, আমরা অধমর্ণ, তাতে কিছু যায় আসে না। যার কল্যাণেই দর্শক বৃদ্ধি হয়ে থাকুক, কিন্তু থিয়েটার তোমাদেরও সবগুলো চলবে না, আমাদেরও চলবে না। এইটে হলেও ভাল। আজকের দিনে সেই সুস্থ, সবল নাটক, মৌলিক নাটক –এ রচনা করতে হবে এবং বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন স্বাদের তৈরী করতে হবে। শিল্পী তৈরী করতে হবে এবং প্রোডাকশন–এমন কিছু মনে করা উচিত নয় যে ওই ইলিউসন ক্রিয়েট করার জন্যেই, ইলিউসন যদি সিনের প্রয়োজনে আসে আসুক। এই তো কত ইলিউসান দেখিয়েছেন, আমার চেয়েও আবার বেশী দেখিয়েছেন পশুপতিদা। আমরা দেখেছি, আর্ট থিয়েটারে শ্রীকৃষ্ণ সেই সুদর্শনচক্র ছুঁড়ে দিলেন, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে শিশুপালের মাথা কেটে বেরিয়ে চলে গেল। শিশুপাল করতেন রাধিকাবাবু[lix]। একেবারে মহাভারতের যা টাইমিং তা টো টো। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ইলিউশান। তখন খুব সামান্য সীমিত জিনিস দিয়ে –তখন ডিমারও ছিল না, এখন তো হাতে ঘোরালে ডিমার হয়। সোডা আর সাজিমাটি, সাবান –জলে দুটো গুলে নেগেটিভ আর পজিটিভ তার ধরে এরকম করে তোলা হচ্ছে, নেভানো হচ্ছে। আজকে বড় সহজ। সবাই তো ইয়ে কচ্চেন - কি কষ্ট করে তা করা হয়েছে সে যদি আপনারা ভাবেন! আমি সব দেখেছি আমার চোখের সামনে। কাজে কাজেই আমায় এখানে কিছু বলতে বললে সেই বিগত দিনের শিল্পীদের জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। অভিনয়ের শিল্পী সেইরকম নেই। হালকা রস – এ তো পরিবেশন সর্বত্র, বেশিরভাগ থিয়েটারেই হচ্ছে। একটু সিরিয়াস হওয়া দরকার -আজকে সিরিয়াস হওয়া দরকার এইজন্যেই, আমি বলছি আপনাদের, এটা আমার নিজের কোন প্রচার নয়, আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন, কিন্তু আমি বলছি, যদি সুস্থ, সবল নাটক যদি হয়, আপনাকে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে বলতে পারি যে, পাঁচটি বছর পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা করে মাসে লাভ করেছিলেন সলিলবাবু, দাবী না করে। ডিভোর্স বিল তখন সবে পাশ হয়েছে। হবার ফলে সামাজিক যে বিপ্লব, তারই একটা চিত্র তুলে ধরেছিলেন, কত পয়সা পেলেন। সুস্থ নাটক হলে পয়সা পাবে না? তার জন্যে নাচ দিতে হবে? বিদেশী নাচ? যাই হোক, আমি শুভকামনাই করি – পাবলিক থিয়েটার এবং আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি যে আমার যারা অনুজ, যারা পরবর্তী কালে এই থিয়েটারকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন, তারা গ্রুপ থিয়েটারও করেছেন এবংগ পাবলিক থিয়েটারকেও তারা সমভাবে ভালবাসেন। বেশির ভাগ যারা আছেন, পাবলিক থিয়েটারের প্রতি তারা বেশি শ্রদ্ধাশীল নন। এই দুটি ব্যক্তি আমার পাশে যাঁরা আছেন, এঁদের যে শ্রদ্ধা আছে, সেই জন্যেই আমি তাঁদের বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে পরবর্তী দিনে তাঁরা যেন শিল্পী তৈরী করেন। সুস্থ-সবল নাটক এবং সমস্ত ধরনের রসের পরিবেশন করেন, সচেষ্ট হন। নটরাজ তাঁদের কার্যসিদ্ধি করবেন।

পবিত্র সরকার

আজকে আমাদের শেষ বক্তা হলেন একজন নাট্য সমালোচক শ্রী দেবাশিস দাশগুপ্ত। শ্রী দাশগুপ্ত নাটক দেখেন সবরকমই। তিনি গ্রুপ থিয়েটারের নাটক প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে এবং পড়াশোনাও করতে হয় সমালোচক হতে গেলে, তাই শ্রী দাশগুপ্তের কাছে পুরো ছবিটা পরিষ্কার। আমি তাঁকে

এখন ধরতে বলছি যে, যে থিয়েটার জাতীয় নাট্যশালা হিসেবে শুরু হল, সেইটা এখন এসে 'পেশাদার থিয়েটার' এই নামে এসে পৌঁছেছে। এই যে বিবর্তনটার মূলে কি কি কারণ, সেটা আমি বলতে বলছি।

<u>দেবাশিস দাশগুপ্ত</u>

যে কোন বেস্পতি-শনি-রবি আপনারা যদি কোনদিন ঐ রাস্তায় যান, বেলা পাঁচটা থেকে অথবা রবিবার দিন ওই তিনটের একটু পরে ওঁরা যাবেন, ওই যেখানে বিশ্বরূপা থিয়েটার[lx], বিজন থিয়েটার, রঙ্গনা, সারকারিনা[lxi] এই সমস্ত থিয়েটারগুলো আছে, সেখানে যে ভিড়টা হয় বিকেলবেলা, সেই ভিড়টা যদি কেউ অপরিচিত থাকেন এবং যদি কোনদিন ওদিকে না গিয়ে থাকেন, তাহলে বুঝবেন না। হঠাৎ গিয়ে মনে হবে যে কোন রথের মেলায় এসেছি, অথবা ছাতাটাঁড়ের মেলায় পুরুলিয়ায় এসেছি –এত ভিড়। একদল লোক বেরোচ্ছেন, ঢুকছেন এবং তিনটের শো শেষ হচ্ছে, পাঁচটার সময় যে ভিড়টা হয়। সুতরাং, দর্শক কমে গেছে এটা বলা চলবে না। দর্শক প্রচণ্ড ভাবে আসবেন এবং তাঁরা কি থিয়েটার দেখছেন আমরা সেইটে আলোচনা করছিলাম। জ্ঞানেশদা বা রবিদা যেটা বলেছেন, দুজনেই আমার খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, তাঁরা নাটকের ক্ষেত্রে যেটা বলেছেন এবং দেবনারায়ণবাবু যেটা বলেছেন পুরনো থিয়েটার সম্পর্কে, সে সম্পর্কে শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, আগে যে থিয়েটারটা ছিল, যেটা একমাত্র থিয়েটার এবং সেই থিয়েটারটা - যেখানে তার জোর ছিল, অভিনয় এবং তার নাট্যরচনা, সেই অভিনয় বা নাট্যরচনা দেখে আমরা কেউ কেউ মিনি শিশির ভাদুড়ী, কেউ কেউ একটু ছোট ইয়ে করবার জন্য –গ্রামে বা লাইব্রেরিতে, অথবা পাড়ার ক্লাবে যখন দুর্গাপুজোর সময় থিয়েটার হত, তখন সাজাহান, চাণক্য, চন্দ্রগুপ্ত[lxii] বা সিরাজদ্দৌলা[lxiii] প্রত্যেকেই করতাম। এখন কিন্তু কোন গ্রামে, পাড়ার ক্লাবে অথবা অফিস ক্লাবে সেই সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত বা সিরাজদ্দৌলা হয়–কিন্তু পাবলিক বোর্ডের থিয়েটারগুলো হয় না। এর কারণ এই নয় যে কটি মেয়ে চরিত্র আছে, মহিলা চরিত্র আছে সে জন্যে নয়। হয় না। কেননা পুরো ব্যাপারটা কি রকমভাবে বদলে গেছে। আমাদের দেশে এই হয়। বিদেশী কোন বিজ্ঞাপনে আমি দেখিনি। আমাদের দেশে নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এইভাবে –একটি মাত্র সেট, একটি মাত্র নারী চরিত্র। এইভাবে নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কেননা সেইটেই আমাদের আকর্ষণ করে, ঐদিকে যায় না। এরসঙ্গে আরও কতকগুলো জিনিস ঢুকে গেছে। যেটা - যে আমরা মনে করি, এই নাটকগুলো করলেই আমরা বোধহয় প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত হব, ঐ নাটকগুলোয় নয়। আবার উল্টো ব্যাপারটাও আছে। সেটাও আমি বলছি। যেমন, তখন যিনি চাণক্য করতে চাইতেন, তাঁরই নাতি হয়ত বাঞ্ছারাম করতে চায়, হয়ত গুঁইবাবা করতে চায় এবং সে গ্রুপ থিয়েটারের নাটক বাছে কারণ ট্রেন্ডটা চেন্জ হয়েছে এবং এটাতে সে প্রগতিশীল হিসাবে চিহ্নিত হয় এবং ওটা করলে বোধহয় খারাপ হয়। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক হয়,

দেবনারায়ণবাবু বললেন গ্রুপ থিয়েটার এবং পেশাদার নাটক, দুটো নাটকের তুলনাতেই আমি আসছি। গ্রুপ থিয়েটারে যখন নাটক হয়, তখন তারা কতকগুলো জিনিস মাথায় রাখেন। তারা সক্রিয়ভাবে সেই কাজগুলো করে থাকেন এবং তার মধ্যে অনেক মানবিক ব্যাপার বাদ যায়। যেমন ধরুন, মানুষের জীবন থেকে প্রেমটা বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু আপনি দেখবেন সাম্প্রতিককালে যত নাটক আছে, প্রেমটা সেটায় নেই, নির্বাসিত। অথচ এটাতো ঠিকই, যে একটা বয়েসে লোকে প্রেমে পড়তেই পারে। যদি না পড়ে থাকে তাহলে ডাক্তার দেখানো দরকার। তার কোনো রোগ আছে। যদি বা প্রেম হয়, তাহলে জিনিসটা এই রকমই দাঁড়ায়, যে একটি ছেলে বা মেয়ে হয়তো লেকের পাড়ে বসে আছে, আবেগভরে কিছু কথা বলল। তারপরে মেয়েটা বলল, "চলো, কালকে রেজিস্ট্রেসন করে আসি।" ছেলেটা বলল, "কালকে? কালকে তো আমার কারখানায় লক-আউট আছে। ওদের পাশে দাঁড়াতে হবে আমাদের।" বলে ব্যাপারটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। কেননা, নইলে সমাজ চেতনা বোধহয় কমপ্লিট হয় না। এইভাবে জিনিসটা উঠে যাচ্ছে। তারপরে যদি ধরুন দেখা গেল ভাল ক্রাইম ড্রামা, সেখানেও কিন্তু একটা মজা আছে। ক্রাইম ড্রামাতে – সেটা বেশ চলছে, সুস্থ, ভালোভাবেই ক্রাইম ড্রামাটা চলছে। তারপরে হঠাৎ দেখা গেল, থানার ওসির শালা নকশাল এবং সেইভাবে নাটকটা তখন অন্য দিকে ঘুরে গেল। আবার পাবলিক থিয়েটারেও আজকাল দেখা যাচ্ছে হাসির নাটক হচ্ছে, তার মধ্যে হঠাৎ এমনকি ক্যাবারে নাচ যে নাটকগুলোতে থাকে তাদের মধ্যেও সবসময় বলা হয় যে, "আমরা এই পথে নামতাম না, সমাজব্যবস্থাই আমাদের এই পথে নামিয়েছে। সমাজব্যবস্থা এর জন্যে দায়ী বলে কিছু সমাজচেতনার কথা এর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দুঃখের ব্যাপার এই যে, আজকে পাবলিক থিয়েটার সম্পূর্ণভাবে দুটো ভাগে ভাগ। দেবনারায়ণবাবুদের কোনদিন বিজ্ঞাপন দিতে হত না –সপরিবারে দেখবার মত নাটক। এটা আমাদের দিতে হয়। ওই কাগজে সেন্টিমিটারের মধ্যে এক লাইন লিখে দিতে হয় – সপরিবারে দেখবার মত নাটক। কিছু কিছু লোকেদের দিতে হয়। আর এক ধরনের নাটক হচ্ছে 'এ'। 'এ'টা এত চলতি হয়ে গেছে যে কোন কিন্ডারগার্টেনের স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি যে 'এ'দিয়ে বাক্য রচনা করতে দিলে অ্যাপল-ট্যাপল না লিখে লিখছে 'অ্যাডালটস'। একটা গল্প বলি, সেটা হচ্ছে, কিছু কিছু এই নাটক দেখবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, দুর্ভাগ্যই বলি, সমালোচনার সূত্রে যেতে হয়েছে, সমালোচনা করিনি। একবার ঠিক করেছিলাম সবকটা মিলে একটা করব, তাও দেখলাম হচ্ছে না, সবই এক। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকটি নাটক ছাড়া দেখবেন ২৫ থেকে ৫০ নাইট–এটা পরিসংখ্যান বলে - 'এ' মার্কা নাটক চলে যায় বাজার থেকে। কেননা যাঁরা দর্শক, তাঁরা শুধু ওটা দেখতে চান না। সারকারিনা বা অমুক চলে, কিন্তু 'পিউ কাঁহা'[lxiv] বলুন, অমুক নাটক বলুন, অনেক নাটক আছে ৫০ নাইট, ২৫ নাইট তারপরে উঠে গেছে। একদিন আনন্দবাজারে বসে আছি, এইরকম একটি 'এ' মার্কা নাটক, তাতে বলা হল যে, আপনারা সকলে একসঙ্গে যাবেন। ঠিক আছে আমরা কয়েকজন একসঙ্গে যাব। তা পত্রিকার যে ড্রাইভার বললে গাড়ি ঠিক আছে, পত্রিকা থেকে যাবে - আমি আপনাদের সঙ্গে নাটক দেখব? আমরা বললাম ভালো কথা। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ও নাটকটা দেখলে ওই গাড়িতে ফিরতে পারব। বাড়ি পৌঁছে দেবে তারপরে যাবে। গাড়িটা রেডি, ও এল। বললে, "আসছি।" বলে গিয়ে একটু পাউডার-টাউডার মেখেটেখে এল। তারপরে গিয়ে যখন নাটকটা দেখতে বসলাম, সেও নাটক দেখে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখি উসখুস করছে। আমি ভাবছি বোধহয় ক্যাবারে নাচটাচের জন্যে আমাদের সামনে লজ্জা পাচ্ছে। ইন্টারভ্যাল হতে সে বলল, "বাড়ি চলে যাব।" তা আমি বললাম, "কেন? তুমি তো নাটকটা দেখতে এসেছিলে, বাড়ি যাবে কেন?" বললে, "না, আমি যাই।" আমি ভাবলাম যে লজ্জা পাচ্ছে। বললাম যে, কেন?– আমার ইন্টারেস্ট তো অন্যদিকে, বাড়ি ফিরব কি করে? বলি যে, "চল, কি হয়েছে?" বললে, "না, চলি। শরীরটা ভাল লাগছে না।" বলে বেরিয়ে যেতে যেতে আমার দিকে ফিরে এল।

ফিরে এসে বলল যে, "আপনাদের ভারি কষ্ট, না?" বলে বেরিয়ে চলে গেল। তার স্বাধীনতা আছে বেরিয়ে যাবার, আমার তো নেই। আমি গেছি সেখানে তিনঘন্টা দেখতে হবে। সে "আপনাদের বড় কষ্ট না" বলে বেরিয়ে চলে গেল, আপনারা দেখতে বাধ্য, আমি দেখতে বাধ্য নই। বহু জায়গায় এই ধরনের নাটক আমি দেখতে গেছি, মোটামুটি একধরনের বক্তব্য থাকে। সেখানেও অভিনয় যখন না থাকে, নাটকের কাহিনী যখন বলিষ্ঠ না হয়, আস্তে আস্তে সে নাটক উঠে যায়। 'পিউকাঁহা' বলুন, অনেক নাটক, আমি নাম করতে চাই না, দু-একটি নাটক ছাড়া কিন্তু কখনোই একশো নাইটও ক্রস করেনি। এখনো দেখা যায় যে, এই বিশ্বরূপায় যে নাটক চলছে, পরপর কয়েকটি নাটক বোধহয় একশো নাইটও পেরোয়নি। এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ যে আমাদের দর্শক সব কিছু গ্রহণ করে না। উল্টো দিক দিয়ে পেশাদার নাটকে রবিদা, জ্ঞানেশদা আছেন, তাঁদের বলতে পারি। এখানেও যখন এ্যাক্টিং হয়, এখানে গ্রুপ থিয়েটার থেকে ওঁরা গেছেন, ওঁরা সবকিছুই করেছেন। কিন্তু সব সময় গ্রুপ থিয়েটার থেকে কোথায় যেন- ওঁরা নিজেরা যখন গ্রুপে প্রোডিউস করেন, আর যখন ওখানে প্রোডিউস করেন তখন ব্যাপারটা কোথায় যেন – এ্যাক্টিং এবং অন্য অন্য ফর্মুলায় কোথায় যেন একটু আলাদা থেকে যায়। থেকে যায় মানে কিভাবে থেকে যায় –বোধহয় ওরাও বুঝতে পারে যে সাধারণ দর্শক এটা চায়। আমি বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত। আমরা গ্রুপ থিয়েটারও কিন্তু কম কমার্সিয়াল নই। আমরা বুঝে নিই যে, এখন এই নাটকে মজা আছে। এই নাটকে আটটা-ন'টা গান লাগাই–যে গানটা বেশ নিচ্ছে এবং অ্যাকাডেমিতে যখন খুব প্রচণ্ড ভাবে নিচ্ছে, আমরা ভেবেছি জনগণের কাছে পৌঁছে গেছে। এতেই বোধহয় কমিউনিকেট করা হল–সাংঘাতিক নাটক। কালকে রাত্তিরবেলাই শো করে ফিরেছি – বেলগাছিয়া মিল্ক কলোনি সেখানেই সেই নাটক কেউ নিচ্ছে না। নিশ্চয় তাঁরা অ্যাকাডেমিতেও নাটক দেখেন। কিন্তু তার ৫%। ৯৫% আছেন বাড়িতে। তাঁরা কোন ব্যাপারেই নেই। সেখানে, যেখানে খুব অশ্লীলতম গালাগালি আছে, সেইখানেই হাসছে, তাছাড়া কেউ হাসছে না, কিছু না। পালাতে পারলে বাঁচি। রাত হয়ে যাচ্ছে। মানে আমরা যেটা ভেবেছিলাম পৌঁছে গেছি –একদম ভুল ভাবনা। কিচ্ছু হচ্ছে না। কিন্তু আবার পেশাদার থিয়েটারে যখন অ্যাক্টিং করা হয়, আমরা যখন দেখতে যাই, হয়তো রবীন্দ্রনাথের কোন নাটক হচ্ছে, সেখানে পেশাদারী অ্যাক্টররাই করছেন, তাঁদের স্কিল সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁরা পার্ট করতে করতে কোথায় একটু জার্ক দিলেন বা কোথায় একটু ঘাড় ফেরালেন বা কোথায় একটু রঙ্গ-ঢঙ্গ করলেন –যেটাতে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথই উল্টে গেলেন। যখন ওটা করা হল, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপারটাই থাকলো না। তার মানে কি রবীন্দ্রনাথ রক্তমাংসের শরীর নিয়ে ওখানে খারাপ ? মোটেই না। সেটা আবার একরকম আছে, যে তারা আধো আধো বোল, লাজে গদগদ বোল করে একরকম উচ্চারণ করলো, সেটাও রাবীন্দ্রিক হল, এটাও নয়। কিন্তু সেই চেতনার কোথায় যেন একটা অভাব থেকে যায়, হয়তো হতে হতে অভ্যাসের ফলে বদ-অভ্যাস একটা হয়। সেজন্য বদ-অভ্যাসগুলো এদের মধ্যে গ্রো করে যায়। যার জন্যে নতুন ধরনের নাটক –দেবনারায়ণবাবু বললেন, আমি মিউজিকের লোক, আমি সেই কথা বলছি। গ্রুপ থিয়েটার থেকে নাটকের সেইগুলোই নেওয়া হয় প্রফেশনাল স্টেজে, যেগুলো ফাঁকিবাজী দেওয়া হয়, করা যায়। যেমন, টেপ রেকর্ডার। যাঁরা গান জানেন তাঁদেরও গান গাওয়ানো হয় না, তাদেরও লিপ মেলাতে হয়। গ্রুপ থিয়েটারে আমি দেখেছি, এটা বলতে খুব লজ্জা করে, সাধারণ ভাবে আমাদের মঞ্চসজ্জা বা লাইট নিয়ে যতটা ভাবা হয়, মিউজিক সম্পর্কে অনেক বড় বড় ডাইরেক্টরের ধ্যান-ধারণা খুব কম। স্টেজ রিহার্সালে আমি দেখেছি বড় বড় ডাইরেক্টররা, নাম করতে চাই না, আমিও সেখানে উপস্থিত, তাঁরা বলছেন, FOH টা একটু কমাও, ঐটে একটু হার্ড হচ্ছে, আচ্ছা, amber টা নেই? আচ্ছা, সেটের –না, না, লেফট স্টেজে–ওই যে, আরে দেখ না–আপার ডেপথটা–এগুলো করা হয়। কিন্তু গানের ব্যাপারে যখন হয় তখন –কি হলো? তালটা –মানেজোরটা একটু কমে গেল না? একটু কম হলো না?

তবলাটা যে সুরে বাঁধা নেই এটা ওঁরা ধরতে পারেন না। এটা কিন্তু কোন সময় বলেন না, তবলাটা সুরে বাঁধা নেই, বা বেহালায় 'রে'টা লাগছে না। এটা আমাকে কোন ডিরেক্টর বলেন নি। এটা অদ্ভুত ব্যাপার, এটা একটু ইয়ে থাকে, যেটা সর্বতোভাবে নয় তবু কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের ছেলেরাই গান গাইছে, প্রফেশনাল থিয়েটারে একদমই না। কেন জানি না সেটা করা হয় না এবং এই যে সাধারণ লোকে নেয়, যেমন, রবিদা বললেন, 'অঙ্গার' নিয়েছে, পরে 'তিন পয়সার পালা' কিংবা 'ভালোমানুষ' আমরা দেখেছি চলেছে। বিদেশী বলেই বর্জনীয় সেটা আমি মনে করি না। অনেক সময় তাতে স্বদেশীয়ানা আরোপ করে অনেক কিছুই করা যায় এবং ওঁরাও জানেন - ওই আর একটা হাসির নাটক চলছিল –এক ধরনের হাসির নাটক আর একধরনের নাটক আছে –বাঙালি কাঁদতে ভালবাসে –সেই ধরনের কতকগুলো গল্প সাজানো হয়। আর একটা হচ্ছে ওই 'এ'মার্কা নাটক। এই তিন ধরনের নাটক চলে এবং সেখানে দেখা যায় ঐ একই ধরনের এ্যাক্টিং। কি রকম যেন ভয়েসটা একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থ্রো করে দেওয়া – থ্রো করে দেওয়া। সূক্ষ্ম ব্যাপারটা রবিদা নিজেই বললেন যে, একটু নামিয়ে নিতে হল, ওদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হল। এখন সেখান থেকেও যখন স্ক্রিন অ্যাক্টর অন্য জায়গায় যান, আমরা তাদের কাছে অন্যরকম আশা করি। সেটা কিন্তু সর্বতোভাবে তাই নয়। রবিদার বা জ্ঞানেশদার কথা আলাদা। তাঁদের আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তাঁরা যখন যে কোন মিডিয়ায় যান, অন্যরকমভাবে ফেলে দেন। কিন্তু আমি বলছি যারা নতুন, গ্রুপ থিয়েটার থেকে, যেটা দেবনারায়ণবাবু বললেন, এখন গ্রুপ থিয়েটার থেকে অনেক ছেলে নেওয়া হয়। কিছুদিন বাদে তারা যখন বেরোয়, তারা তখন নিজেরা প্রোডাকশান করেন তখন দেখা যায় অন্য প্রোডাকশানে গিয়ে তাদের অন্যরকম চেহারা। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র জন্মোৎসব শেষ হয়ে গেল। আমি দেখলাম তারাই করলেন কিন্তু কোথায় রবীন্দ্রনাথ যেন আরেকবার মারা গেলেন। তা এইভাবে থিয়েটারগুলো চলে এবং তারা ঠিক পাবলিক পালসটা বোঝেন এবং বুঝে নাটক করেন। আমরা তো বরাবরই বলছি, গ্রুপ থিয়েটারেও দেখেছি, পাবলিক থিয়েটারেও দেখেছি যে নাটক করতে গিয়ে ওঁরা বুঝতে পারেন যে আমরা ভাবছি 'কালবৈশাখী-টাখী' দারুণভাবে হল। কিন্তু 'থানা থেকে আসছি' নতুন নাটক করা হল, দেখা গেল দর্শক নিল না। চেষ্টা যে হয়নি তা না। আবার কোন কোন চেষ্টায় হয়, সেটা রবিদা জানেন, জ্ঞানেশদা জানেন। এখানে আমি মনে করি, যারা দুটো জায়গায়তেই মেলাতে পারেন, তারা খুব ভালো শিল্পী। যেটা রবিদা বা জ্ঞানেশদা। আমরা সবসময় পারি না। আমি জ্ঞানেশদার একটা বইতে কাজ করেছিলাম। সেটা হচ্ছে 'ভাঙা গড়া খেলা'। সে বইতে জ্ঞানেশদা বলতে পারবেন আমি মিউজিকে বোধহয় প্রফেশনাল স্টেজের থেকে অন্যরকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু নাটক চলে নি। মিউজিকের সম্বন্ধেও আমি কোথাও কিছু শুনিনি যে খুব একটা ভালো হয়েছে বা কিছু সেরকম কিছু। তার মানে ঐ দর্শক, তারা ওইটে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল, ওটা নয়। সেখানে আমার রবীন্দ্রনাথের একটা কথাই মনে পড়ে, হল না ঠিক আছে, কিন্তু আমার আঁধার ভাল/ আলোরে যে লোপ করে খায় সে কুয়াশা সর্বনেশে। নমস্কার।

<u>পবিত্র সরকার</u>

আমাদের আলোচনার অংশ শেষ হয়ে এসেছে। একটা আমি শুধু –মানে পশুপতিদা এসেছেন বলেই আমি সুযোগটা নিচ্ছি। আপনাদের সকলের অনুমতি নিয়ে যে পশুপতিদা, শ্রী পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। 'নাচঘর' পত্রিকা একসময় সম্পাদনা করেছেন।তাঁর কাছ থেকে আমরা খুব অল্প কথায় একটু এখনকার পেশাদার রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তাঁর নিজের মতামত আমরা একটু শুনতে চাই। হয়তো আমাদের সকলেরই বাড়ি ফেরার তাড়া আছে, তবে পশুপতিদা আছেন বলেই আমরা একটুখানি তাঁকে অনুরোধ করছি।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

নমস্কার। আমি শুনতে এসেছিলাম, বলতে আসিনি। কিন্তু পবিত্রবাবু অনুরোধ করলেন। তার আগে জ্ঞানেশদা বলেছেন, আমি মাত্র দুটি কথা বলব। একটা সে যুগের, একটা এ যুগের। আমি সে যুগের বলতে গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু এঁদের অভিনয় আমি দেখিনি, কিন্তু সে যুগের আর একজন stalwart, তার নাম অমৃতলাল বসু,[lxv] তাঁর অভিনয় আমি দেখেছি। তা সে অভিনয়ের কথা বলতে গেলে অনেক বলতে হয়। আমি যদি ওই পরবর্তী দিনে আসি, সে সময় বলব। সে যুগের যে কথাটা এখন বলব, সেটা হচ্ছে এই যে, সে যুগে প্রতিটি অভিনেত্রীকে গান এবং নাচ জানতে হত। এমনকি তারাসুন্দরী[lxvi], যিনি নাট্যসম্রাজ্ঞী বলে বিখ্যাতা, যাঁর রিজিয়া দেখে আমি বলেছিলাম যে সত্যিকারের রিজিয়া বোধহয় এতখানি ব্যক্তিত্বসম্পন্না ছিলেন না। সেই তারাসুন্দরী যিনি নাচতে জানতেন এবং জানতেন মানে কি, তিনি হচ্ছেন নৃত্যাচার্য নেপা বোসের শিক্ষিকা। নেপা বোস[lxvii] তাঁর কাছ থেকে নাচ শিখেছেন, এইটা শুনে রাখুন আমার কাছে এবং তিনি গান গাইতেন। তাঁকে স্টেজে গান গাইতে হত। যদিচ তাঁর গলা কিছুটা পুরুষালি ছিল। সেখানেতে আজকের এই টেপ রেকর্ডার বাজিয়ে গান –অকল্পনীয় ছিল। যদি টেপরেকর্ডার সে যুগেও থাকত, ভেঙে ফেলে দেওয়া হত। ওটা হচ্ছে অপপ্রবেশ–চলে না। প্রত্যেকটা মেয়েকে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে নাচও জানতে হবে, গানও জানতে হবে। তা নইলে পরে তাকে - রিজেক্টেড। হবে না। এই হচ্ছে সেই যুগের কথা বললাম। আর এ যুগে আমি দেখেছি, খুব মনোকষ্ট পেয়েছি বিশ্বরূপা থিয়েটারে কোন কোন নাটক দেখে। আমার মনে হয়েছে, আজকের যুগ তো খালি সামাজিক নাটকের যুগ। তাও যে নাটকগুলো যে কি নাটক –হিসেব করে পাওয়া যায় না। মানে দুইয়ে দুইয়ে চার হয়। এ দুইয়ে দুইয়ে তিন কি সাড়ে তিন কি পাঁচ যা হোক হতে পারে, কিন্তু চার নয়। এইধরনের নাটক এবং সে নাটকেতে ভোজবাজী, টেপ রেকর্ডার, অমুক-তমুক–তার সঙ্গে ঢুকেছে ক্যাবারে নৃত্য। কেন রে বাবা? না লীকে খুশী হয় না। আমাকে স্বয়ং রাসবিহারী সরকার[lxviii] নিজে বলেছেন, যে, পশুপতিবাবু, আজকে নাটকে কিছু সেক্স না দিলে নাটক দেখতে আসবে না লোকে, এই হচ্ছে আমার দৃঢ় ধারণা এবং আমি সেই পথে চলেছি। এটা রাসবিহারী সরকার আমায় নিজ মুখে বলেছেন এবং তারপর থেকে আমি থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। আমি যাই না।

প্রতিভা অগ্রবাল

অরণি বাবু, আপনি কিছু বলুন –

অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়

আপনারা যে উচ্চারণের কথা বলছিলেন না, বিকৃতি –যাত্রায় যে উচ্চারণের কথা বলছিলেন, ওটা কি বিকৃতি না ইচ্ছে করে করে –

রবি ঘোষ

না, আমার তো অভিজ্ঞতা অত বেশী নেই। আমি বাচ্চা বয়সে আগেকার দিনের যাত্রায় অভিনেতাদের দেখেছিলাম –ফণী বিদ্যাবিনোদ[lxix], তারপরে ছোট ফণী। সেইসময় ওঁদের যেটা দেখেছি–ভাদুড়ীমশায়ের অ্যাক্টিং আমরা ধরুন লাস্ট স্টেজে দেখেছিলাম, অহীনবাবু, ভাদুড়িমশায়। সেখানে কিন্তু আমরা এই এখন যে থিয়েটার করি, ঠিক ওই পর্যায়ে- ধরুন আপনি বিদেশের থিয়েটারে যেরকম ডিকশান, যেটা বলি আমরা, pronunciation diction –সেটা ছিল ভাদুড়িমশায়দের, যাত্রায়ও ওনাদের তাই ছিল। কিন্তু এখন উচ্চারণ দুষ্ট হয়ে গেছে। 'স' এসে যায় মাঝে মাঝে। 'স'এর যে তিনটে ভাগ, এইটে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, বা অহেতুক এ্যাক্সেন্টকে স্ট্রেস দিয়ে ফেলে কতকগুলো ওয়ার্ডকে–এইটেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বলছে খুব sleekভাবে।আমার বক্তব্য যে যাত্রায় যে অনেক ভুলভাল হয়, যদিও সেটা কি করে চলে যাচ্ছে, ভীষণ কিছু

কায়দা –এখন আপনারা তো জানেন, দেবুদা বললেন বা পশুপতিদা বললেন, যে যাত্রাতে টেকনোলজি ঢুকে গেছে, গ্যাজেটারী আর কি যেটাকে বলে, ফলে লোকের কান যেটা এখন বলি, আমি একদিন একটি লেখাপড়া জানা মেয়েকে ওই গিরিশবাবু পড়লাম –উৎপলবাবু 'গিরিশমানস' লিখেছেন তো, তা ও বললো, "আমার ভালো লাগে না।" এম এ পড়ে মেয়েটি। তা আমি বললাম, "আমি পড়ি, শোনোতো"। ছোট্ট স্পিচ–'জনা' থেকে।ঐযে, 'হে মুরারি /বুঝিতে না পারি/ এ দুর্মদ অরি/কিভাবে বধিব অর্জুন/দেখেছি হির্মির বকে/শতধায় কীচক নিপাত –পড়লাম। শুনলো। তারপর পড়লাম রবীন্দ্রনাথেরটা–'মাতা করিয়ো না ভয়/ কহিলাম পাণ্ডবের হইবে বিজয়/ আজি এই রণক্ষেত্রে'। বললুম, "কোনটা ভালো লাগল?"'রবীন্দ্রনাথ'। কেন? না, কানে শুনতে ভালো লাগে না ওটা। যেটা বললেন দেবুদা কারেক্ট একেবারে। এই জিনিসটা আমরা নাট্যকর্মী হিসাবে বহুদিন ধরে এই জিনিসটা কেউ পালন করিনি। আজকে যাদের বয়স ৩০ বছর বা ৩৫ বছর, ১৮ বছর থেকে ধরা যায় যদি, তাদের কিন্তু কান তৈরি হয়ে গেছে মোটামুটি ভুল উচ্চারণে। বুঝলেন, ভুল উচ্চারণ, ভুল ডিকশান, ভুল অ্যাক্সেন্ট– এইতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ফলে, এই পুরো কানের সাউন্ডটাকে ভাঙতে গেলে যে দায়িত্বটা পালন করতে হবে, সেটা কিন্তু সাংঘাতিক দায়িত্ব।

<u>অরণি বন্দ্যোপাধ্যায়</u>

কারণ, এটা করতে গেলে ভার্স দরকার লাগে, ভার্সই হয় না এখন।

<u>রবি ঘোষ</u>

ভার্স কেন? গদ্য উচ্চারণেও যে পরিষ্কার উচ্চারণ পদ্ধতি আছে একটা, বলার ভঙ্গি, যেটা অনেকেই আমরা বক্তৃতার সময় শুনতে পাই শিক্ষিত লোকেদের, সেটা কিছুতেই অভিনয়েতে –আমি একটি ইয়ং ছেলের অভিনয় সেদিন দেখছিলাম, "আচ্ছা আপনি কেমন আছেন?" খুব জড়িয়ে শেষের অংশটা বলে ফেলল। আমি বললাম, "তুমি এটা বললে কেন?"বললে, "কেন রবিদা, কি ভুল হল?" বললাম, "তোমার আপনি শুনলাম, আছেনটা শুনলাম, মাঝেরটা বুঝলাম না। মাঝেরটা ধরে নিলাম কিন্তু আমি।" মোটামুটি দর্শকরা আজকাল এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ধরে নেয়। হয়তো বা ডায়লগ লেখা ভালো হয় না। অভিনেতার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডায়লগ লেখা হয় না বা ওই যেটা বললেন, ট্রেনিংটা প্রপার নাই এখন বলতে গেলে।

<u>প্রতিভা অগ্রবাল</u>

দর্শক বেচারা কি করবে? এখন যদি এই অ্যাক্টর্সরা ভালো না বলেন –দর্শককে তো গ্রহণ করতেই হবে।

<u>রবি ঘোষ</u>

আমি দোষ দিচ্ছি না তো –

<u>দেবনারায়ণ গুপ্ত</u>

দর্শকেরা গ্রহণ করছে, যা খাওয়াচ্ছি তাই খাচ্ছে।

<u>পবিত্র সরকার</u>

সাধারণভাবে, বলার ভাষার স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু নেমে যাচ্ছে। আগে শিক্ষিত ছেলের যে ধরনের articulation ছিল, এখন দেখবেন 'স'টা আপনার আমার ঘরের ছেলেমেয়েরাও বলছে।"স'-'স'করছে। 'র'এর সঙ্গে 'ড়'এর তফাত করতে পারছে না। নাটক দেখতে গিয়ে আমি প্রায়ই শুনছি যে একটি মেয়ে, সে শিরোশিশ অফ লিভার বলে যাচ্ছে। ইংরেজি 'স'এর উচ্চারণ সে করতেই পারছে না। এইটে আবার ওই ভীষণরকম জোর দিতে হবে।

<u>রবি ঘোষ</u>

ভালো অভিনেতাও দরকার।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

Elocution ঠিক করবার জন্য চেষ্টা –এগুলো করতেই হবে।

রবি ঘোষ

আমি একটা কথা বলি, আজকে কলকাতায় এগুলোর সামাজিক দায়িত্বও তো আছে। আমাদের বাঙালি জাত অভিমানী জাত –আমায় কেউ দেখল না। অনেকেই আছে। মহৎ ব্যক্তিদেরও হয়েছে অতীতে, কেউ বাদ নেই সেখান থেকে। আমার মতে এ ব্যাপারে শিক্ষক হতে পারেন একমাত্র শম্ভু মিত্র, আর কেউ না। শম্ভুবাবু – শম্ভুদা। হ্যাঁ, আজকের দিনে তিনি চুপচাপ ঘরের মধ্যে বসে থাকছেন, এটা গভর্নমেন্টেও কেউ চিন্তা করছে না। গ্রুপ থিয়েটারের বহু ইম্পর্ট্যান্টজনকে ডেকেছি, বলেছি, তোমরা কেন ভদ্রলোককে গিয়ে বলছ না আপনি উইকে একদিন করে শুধু আমাদের উচ্চারণ পদ্ধতিটা শেখান, আর কিছু দরকার নেই। you are the last man। যে লোকটার last row থেকে বসে প্রত্যেকটি word like bells শোনা যায়। Gielgud সম্পর্কে আমি একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম –Gielgud কীরকম? He rings like a bell! কি সুন্দর বলল প্রত্যেকটা কথা, মনে হবে যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে কানের মধ্যে চলে আসছে। শম্ভুবাবুর মত লোককে আমরা কিন্তু কোন গ্রুপ থিয়েটার এক্সপ্লয়েট করতে পারলাম না। না, বলছি দায়িত্ব তো নিশ্চয়ই আছে। তাঁকে বুঝিয়ে এনে –সেরকম লোকতো নেই আর। আর আপনি যদি আমায় বলেন I am never a teacher, I am a performer। এই প র্যন্ত। এখন পারফরমার হতে গেলে যেটুকু শিখতে চায় শিখুক। কিন্তু শেখাবার যে একটা ভঙ্গি, উনি ঐটে নিয়ে চর্চা করেছেন। ভাদুড়িমশায়, কালিদা একদিন আমায় বলেছিলেন, আমি জয়সিংহ করতে গিয়েছিলাম ওনার কাছে, তা আমার তখন প্রচন্ড নাম কলকাতায়, গণশা-টণশা করে নাম করেছি, আমার দিকে তাকালেন, চিনলেনই না প্রথমে, উনি বায়োস্কোপ-টোপ (bioscope) দেখেন না। বললেন যে, "তুমি জয়সিংহ করেছ?" আমি বললাম, "হ্যাঁ"। বললেন, পড়োতো, ওরকমভাবে বসে পড়তো"। আমি ঐ অপর্ণার সাথে যে স্পিচটা খুব কায়দা করে পড়তে আরম্ভ করে –তিন লাইন না চার লাইন মাত্র পড়েছিলুম, উনি আমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। তারপরে whole জয়সিংহটা পড়ে গেলেন। আমি একেবারে মানে সেই –মানে কি বলব–অবাক হয়ে শুনলাম একটা জিনিস –আমি জীবনে পারবনা প্লে করতে। পুরো রবীন্দ্রনাথ পড়া খুব কঠিন– ওরকমভাবে রবীন্দ্রনাথ পড়ে না, শোনে। মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটা word, প্রত্যেক sentence নিংড়ে তার মানে বের করে লোকের কাছে পৌঁছচ্ছে।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

তখনকার একটা কথাই ছিল যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের সমান মর্যাদা থাকবে।

প্রতিভা অগ্রবাল

কিন্তু আপনি যে কথাটা –রবিবাবু, কথাটা আপনি ঠিকই বললেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে শম্ভুদাকে কি করে ধরা যায়, কিছুতেই আমরা কেউ ধরতে পারছি না।

রবি ঘোষ

ওটা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

শিবকুমার যোশী

আমি মারাঠি, গুজরাটি, বাংলা তিনটে থিয়েটারই দেখেছি। পার্সি থিয়েটারের কি impression আপনাদের আছে আর বাংলা থিয়েটারের ওপর পার্সি থিয়েটারের influence ছিল কিনা, এখানে আছে কিনা–পার্সি থিয়েটারের যা influence, সেটা কি পাবলিক থিয়েটারের ছিল? বাংলা থিয়েটারের কোন influence ছিল কিনা এখনো আছে কিনা

দেবনারায়ণ গুপ্ত

একটাই মাত্র influence আছে, সেটা হচ্ছে illusion। অর্থাৎ দিনশ ইরাণীর[lxx] কয়েকজন ছাত্র, নানুবাবু, পরেশ বসু –ওঁর অ্যাসিস্টেন্ট ছিলেন যাঁরা, ইলিউশান তৈরী করতে পারতেন, সেট ডিজাইন করতে পারতেন এবং পটলবাবু, অর্থাৎ পরেশ বোস, তিনি অনেক কাজ করেছেন। নানুবাবু অর্থাৎ মণীন্দ্র দাস তাঁর কাছে এইটে শিখেছেন। কিন্তু তাঁদের বইয়েতে অ্যাক্টিং তো কিছু থাকত না, পার্শি থিয়েটারে, আমি যা শুনেছি, আমি দেখিনি। সেখানে ইলিউশান থাকত।

শিবকুমার যোশী

ডায়ালগ যেভাবে থ্রো করা হয়, এর মধ্যে আমার মনে ছিল তখনও বাংলা থিয়েটার দেখিনি ওর আগে, মানে যখন আমি অহীনবাবু দেখেছি, শিশিরবাবু দেখেছি, দুর্গাদাস [lxxi]কে দেখেছি, সে সময়কার একেবারে influence চলে গিয়েছিল। পার্সি থিয়েটারের influence যা ছিল, ওরা ঠিক wipe-out করে দিয়েছিল। মারাঠিতে যা হয়, গুজরাটি থিয়েটারে যা হয় আরকি! কিন্তু গোড়াতে কি পার্সি থিয়েটারের কোন influence ছিল? ও সময় কি আমরা ইনহেরিট কিছু করেছি?

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

আমার তো মনে হয় না।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

সেটের কাজ কিছুদিন ছিল, অভিনয়ের দিক থেকে কিছুই ছিল না।

রবি ঘোষ

ইনফ্লুয়েন্সবেশি তো Western Theatre থেকে এসেছে।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

ময়দানে যে একটা গ্রুপ থিয়েটার ছিল না? যেখান থেকে দেখে এসে সেটা কপি করে –

দেবনারায়ণ গুপ্ত

পার্সি থিয়েটারে তো ড্রামা কিছু ছিল না, ওর একটা এন্টারটেনিং ভ্যালু ছিল।

শিবকুমার যোশী

কোহিনূরের মালিক বোধহয় ওরা ছিল –

দেবনারায়ণ গুপ্ত

কোরিন্থিয়ান থিয়েটার।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

দেবুদা, ওই ময়দানে যে থিয়েটার হয়েছিল, যার ডিজাইন দেখতে গিয়ে ছবি এঁকে নিয়ে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার করা হয়েছিল না? সেখানে তো ইংলিশ থিয়েটার ছিল?

দেবনারায়ণ গুপ্ত

হ্যাঁ, ছিল। ইংলিশ থিয়েটার ছিল।

শিবকুমার যোশী

নর্থ কোলকাতা আর দক্ষিণ কোলকাতা, অডিয়েন্সের দিক থেকে কি তফাত এসেছে?

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

হত। আগে আমরা যেটা অভিনয় করতে গিয়ে দেখেছি যে, নাটকটা কোলকাতায় যে জায়গাটা রি-অ্যাক্ট করছে, রিমোট ভিলেজে গিয়ে দেখেছি সেম জায়গায় রি-অ্যাক্ট করছে।

রবি ঘোষ

না, উনি যা বলছেন, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে সাউথ ক্যালকাটায় একাডেমিতে যে অডিয়েন্সটা আসছে, ওটা completely homogeneous audience। তারা কিন্তু সত্যিকারের নাট্যের পরীক্ষা দেখতে যাচ্ছে, তারা এন্টারটেন্ডহতে যাচ্ছে না। কিন্তু এন্টারটেন্ড হওয়া ভাল। তারা কিন্তু দেখতে যাচ্ছে নাটকের সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কি হচ্ছে। অর্থাৎ মোটামুটি bulk audience চিনতে পারা এক, আর এখানে তো heterogeneous audience। যেটা দেবুদা বললেন, কারেক্ট। যে সামনের রো'তে বসে আছে, কিছু নাট্যরসিক, প্রফেসর, জজ, পেছনে কিন্তু বসে আছে পটলওয়ালা, আলুওয়ালা –বুঝলেন? মানে এতখানি উল্টোপাল্টা ব্যাপার রয়েছে। মানে এই এলিমেন্টগুলো একটা সুরে দিতে হবে। এখানে কিন্তু সবাই homogeneous audience। প্রত্যেকেই যারা দেখতে আসে গ্রুপ থিয়েটার, তারা চিন্তা করে নিয়ে দেখতে আসে –যারা ভাল জিনিস খুঁজছে। কি করছে, ভুলও হতে পারে।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

এখানে যারা উপস্থিত আছেন, এঁরা কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইন্টারেস্টেড ঐ একাডেমিতে থিয়েটার দেখার। তারা কিন্তু প্রোফেশনাল থিয়েটার দেখতে যাচ্ছে না। তার কারণ আমার থিয়েটারে এক্সপেরিমেন্ট চলছে।

রবি ঘোষ

হ্যাঁ, দরকার নেই তো প্রোফেশনাল থিয়েটার দেখার। কারণ, প্রোফেশনাল থিয়েটারে যে প্রচণ্ড মজাটা ছিল, দেবুদা বললেন, পশুপতিদাও যেটা বললেন, একটা সত্যিতো মজা! এখন ক্ষমতা কমে গেছে, আর রাজার রোল কেউ করে না। রাজার পার্ট করতে গেলে যে গলার জোর, দেহের জোর, মানে দমের জোর দরকার, সে সব নাই আমাদের। আমরা ওই জন্য ছোট ছোট- মধ্যবিত্ত হয়ে গেছি আমরা – ছোট ছোট আমাদের–যেমন, "কেমন আছিস?""ভালো আছিস?" এর বেশি বাড়েনা। তিন লাইন সেনটেন্স হলেই আর দম থাকে না আমাদের। ফ্যাক্ট কিন্তু এটা। আপনি দেখবেন না কোন নাটকে –রিসেন্টলি একটা নাটক নাকি লন্ডনে হয়েছে, আমার এক বন্ধু এসে বলল, "তুমি করবে?" আপনি মধুকে জানেন নিশ্চয় সে, ওই কি নাটক আমি পড়িনি–

প্রতিভা অগ্রবাল

স্বরণ চৌধুরী

প্রতিভা অগ্রবাল

Mouse Trap?

রবি ঘোষ

না, ইয়ে সব কিছু হাড়-গোড় ভেঙে গেছে, বিছানায় শুয়ে রয়েছে এরকম -

প্রতিভা অগ্রবাল

Who's life it is anyway

রবি ঘোষ

ফলে total একটা দেড়পাতা না আড়াই পাতার স্পিচ বলে, অ্যাক্টরস স্টেজের ডানদিকে বসে এইভাবে –কিন্তু অডিয়েন্স সেখানটায় বসে থাকে।

স্বরন চৌধুরী

Not দেড়পাতা, It was the whole play

রবি ঘোষ

আমি বিনয় করে বললাম আর কি, না জেনে -

স্বরন চৌধুরী

–you know, he does not move, except eye, only walking through his voice totally-

রবি ঘোষ

তাহলে বুঝুন, কতখানি ক্ষমতার দরকার।

স্বরন চৌধুরী

And he left us spellbound!

প্রতিভা অগ্রবাল

কে? বাদল বাবু? কিন্তু ঐটা ছোট্ট জিনিস, ইন্টিমেট থিয়েটারে, সেটাও কিন্তু সত্যি খুবই প্রশংসনীয় কাজ। আচ্ছা, একটা কথা সত্যি আমি জানতে চাই, পশুপতিদা বললেন, যে বাংলা থিয়েটারে এখন সেক্স না হলে –মানে একটু সেক্স দিতে হয়। সেক্স না দিলে কাজটা চলে না। আচ্ছা, সেটা কি সত্যি? আমি রিসেন্টলি দেখিনি। কিন্তু আমি 'চৌরঙ্গী' দেখেছিলাম, আমার মনে হোল যে, এমন Incipid ক্যাবারে করা উচিত নয়। আর করলে কি লাভ আছে? আমি জানি না, এটা বাংলাদেশের লোকেদের সংস্কার ছিল যে চুপ করে বসেছিল –একটি মেয়ে নাচতে এল and she was wearing quite decent dress–swimming costume মত। এমন কিছু বিকিনি-টিকিনি ছিল না। আর তারপরে, মানে কোন রি-একশান নেই হলে। আমাদের দেশে বোধহয় ঐ প্রথম ক্যাবারে নামানো হয়েছিল 'চৌরঙ্গী'তে। আর আমি সত্যি করে গেলাম এইটা দেখতে যে what is the

re-action! আমি জানি না, এখন কি আজকালকার যেটা করা হয়েছে has it changed না কি ঐরকমই ক্যাবারেটা হচ্ছে? আর কীরকম ভাবে সেক্সকে এক্সপ্লয়েট করা হচ্ছে?

দেবনারায়ণ গুপ্ত

ছেলের অন্নপ্রাশন, অন্নপ্রাশনের সিন, আত্মীয়স্বজন এসেছে –সেখানেও ক্যাবারে!

রবি ঘোষ

একটা কথা বলতে বলেন দেবুদা, ভেবে দেখেন আমি বলছি, সামাজিক দিক থেকে বলছি, মানে আমাদের সামাজিক নিয়ম-কানুন আছে তো কতগুলো। সায়েবরা – আপনি যাই বলুন, ভারতবর্ষ ওরা প্রথম চিনেছিল, আর কেউ চেনেনি। ওরা কিন্তু সব রেস্ট্রিকশান করে দিয়েছিল। bow-tie পরে রাত্রিবেলা গ্র্যান্ডে ঢুকতে হবে এবং এত টাকা লাগবে ঢুকতে, বসে খেলেই লাগবে এত টাকা –তখন হবে একটা ক্যাবারে। অর্থাৎ একটা ক্যাবারে দেখতে গেলে আপনাকে আজ থেকে ৩০ বছর –৪০বছর আগে পেমেন্ট করতে হত প্রায় ১০০ টাকা। বুঝলেন? ওরা কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছিল সব মানুষকে – ওরা কিন্তু সমস্ত আটকে দিয়েছিল। এখানে ঢুকতে গেলে এই করতে হবে, ওই করতে হবে। ফলে আমরা ওখানে যেতে পারিনি বলে যেতাম না। পয়সাওলা লোকও যেত না। কলকাতার পয়সাওলা লোকও কিন্তু গ্র্যান্ডে ঢুকত না সবসময়। রাসবিহারীবাবু, আমি বলব অত্যন্ত দুষ্ট বুদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও প্রথম এটা ভাবলেন যে পাঁচ টাকায় ক্যাবারে আমি দেখাব, তিন টাকায় ক্যাবারে দেখাব। শেফালী সেই সময় কিন্তু Lido তে নাচছে। মাথায় ওনার যে বুদ্ধিটা এসেছিল সেটা খুব দুষ্টবুদ্ধি ডেফিনিটলি যে আমি আজকে এই যে মধ্যবিত্ত সমাজটা যারা জীবনে কোন দিন ভাবতেই পারেনি গ্র্যান্ডে কি করে ঢুকতে হয় আমি সেই বিশাল শ্রেণীটাকে আমি শেফালীকে দেখাব – শেফালী লিডোতে নাচছে? সেখানে ১০০ টাকায় দেখেন? আমি পাঁচটাকায় দেখাব। উনি সেটা চালু করলেন প্রথম এবং সত্যি তাই আপনি যেটা বললেন, কেউ কোন রি-এ্যাকশন হচ্ছে না –রি-এ্যাকশন হওয়া সম্ভব না তো। আমাদের মধ্যবিত্ত যে ইনহিবিশন, তাতে ঐ কেউ শেফালীকে দেখে 'আঃ' বলে তারপর দিন তারপাশের লোক তার সঙ্গে কথা বলবে না। প্রত্যেকেরই কিন্তু ভাল লাগছে মনে মনে–

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

আরেকটা ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে যে, একটা হোটেলে ঢুকতে গেলে ১০০ টাকা খরচ পড়বে। সে খরচ করার সঙ্গতি অনেকের থাকে না।

রবি ঘোষ

না, খরচা-টরচা না। ঐ যে নানান রকম কায়দা-ফায়দা, বো-ফো–নানারকম নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, না গেলে–যেতে পারেনা বাঙালি সহজে।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

নিয়ম –টাকাও তো অনেক খরচ হয়।

রবি ঘোষ

টাকা দিতে পারে অনেক লোক আছে।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

আমি সাধারণ মধ্যবিত্তের কথা বলছি।

রবি ঘোষ

এখন তো যাচ্ছে গ্র্যান্ডে। তেলচিটে জামা পরে ঢুকে যাচ্ছে। কোমরে একগাদা টাকা আছে, আটকাতে পারবে না কিন্তু।

প্রতিভা অগ্রবাল

আচ্ছা, ক্যাবারে ছাড়া আর কীরকম ভাবে সেক্স এক্সপোজ করা হচ্ছে?

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

ডিস্কো-টিস্কো করা হচ্ছে। সম্প্রতি কাগজে পড়েছেন ঊষা উত্থুপ বা মিঠুন চক্রবর্তী কে দশলক্ষ না কত টাকা দেওয়া হল।

রবি ঘোষ

যাত্রায় ক্যাবারে নিয়ে যান না, যাত্রায় ক্যাবারে–

প্রতিভা অগ্রবাল

যাত্রায় ক্যাবারে এসে গেছে?

রবি ঘোষ

ইঁট মেরে বন্ধ করে দিয়েছিল। আপনি সখির নাচ দিন চলবে। ওই জাঙিয়া পরে যাত্রায় –ভেতরের গ্রাম্য সমাজটা এখনো এমন কন্সার্ভেটিভ যে আপনি সখির নাচ দিন, আপনি সাঁওতালী নাচ দিন জামা-কাপড় পরে চলবে, সব শুনবে। ক্যাবারেতে সেদিন ইঁট পড়ে গিয়েছিল। বন্ধ করে দিয়েছিল ক্যাবারে।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

রাসবিহারীবাবু আর একবার করেছিলেন। যখন ঐ ক্যাবারে নিয়ে খুব কথাবার্তা উঠল, গভর্নমেণ্টের ট্যাক্স বসানোর কথা হচ্ছে, তখন রাসবিহারীবাবু বললেন যে –অজন্তা নাচ–

প্রতিভা অগ্রবাল

'অজন্তা নৃত্য' নাম দিয়েছিলেন?

দেবনারায়ণ গুপ্ত

ওঁরা এই কথা বলেছিলেন যে, এই মন্দিরে এইরকম ছবি আছে। সে সব ব্যাখ্যা তার করা যায়। কি জন্যে আছে সেটা তো আর ভেবে দেখলেন না।

প্রতিভা অগ্রবাল

আমি পবিত্রবাবুকে অনুরোধ করছি যে উনি –

পবিত্র সরকার

না, আলাদা করে বক্তৃতা দেবার কিছু নেই। আপনারা যাদের কথা শুনলেন তাঁরা মোটামুটি এক সুরেই কথা বললেন যে, পেশাদার থিয়েটারের এই মুহূর্তে যা অবস্থাটা, সেটা একটু গোলমেলে। এক টা দিক- সেটা দেবাশিস আলাদা করে দিলেন যে একটা দিক তারা চাইছে ক্যাবারে বা ঐ ধরনের কিছু কিছু উপকরণ এনে পয়সা রোজগার করতে। আর একটা দিক, সুস্থ নাটক করে একটা ভাল প্রতিযোগিতা খাড়া করবার চেষ্টা করছেন। আমরা সকলেই এখানে যারা আছি, সকলেই চাই যে এঁরা জিতুন, প্রতিযোগিতায় জিতে যান এবং সত্যিকারের বাংলা পেশাদার থিয়েটারের যেটা ঐতিহ্য, যেটা জাতীয় নাটমঞ্চ হিসেবে শুরু হয়েছে, সেই ঐতিহ্যটা যাতে আরো স্থায়ী হয়।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়

আমরা জিতব। আমরা গ্যারান্টি দিচ্ছি জিতব।

পবিত্র সরকার

এইটেই আমরা চাই এবং ক্যাবারে–দেবাশিস বললেন এটা–আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে ক্যাবারে টিঁকবেনা এবং টিঁকছেনা। ফলে এখানেই আমি চেয়েছিলাম যে এমন একজন কেউ থাকবেন যে ঐ ক্যাবারের পক্ষ থেকে যিনি

বলবেন যা করছি বেশ করছি, এইজন্য করছি। তাহলে আর একটু বোঝা যেত তাদের দিক থেকে কি বলার আছে সেইটে। আজকে আমরা সভা এখানেই শেষ করছি। এর পরের দিন আমরা গ্রুপ থিয়েটার সম্বন্ধে আলোচনা শুনব। সেটাও ইন্টারেস্টিং হবে। কেননা গ্রুপ থিয়েটারের জায়গাটাও খুব গণ্ডগোলের। লোক হচ্ছে না। অথচ আমরা অনেক বড় বড় কথা বলে যাচ্ছি। বিরাট বিরাট সব এ করছি –কাজেই সেটাও খুব আকর্ষণীয় হবে বলে আমার বিশ্বাস। আজকের সভা এখানেই শেষ করছি।

নাট্য শোধ সংস্থান

পেশাদারী মঞ্চের মহারথীরা

(১৮৭২ – ১৯৮০) (আনুমানিক)

(১৯২৫ - ১৯৯৫) (আনুমানিক)

পেশাদারী রঙ্গালয় : ইতিহাসের পাতা থেকে

উৎসাহী পাঠকদের জন্য পেশাদারী থিয়েটারের একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ এখানে মুদ্রিত হল। যদিও একশো বছরেরও কিছু বেশি সময় ধরে চলা বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ ইতিহাস এটা নয়, বলা সম্ভবও নয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকদের জন্য সমান্য তথ্য তুলে ধরা হল। বানিজ্যিক বাংলা থিয়েটার গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন মঞ্চকে কেন্দ্র করে। এই অতি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ তাই উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রঙ্গালয়কে নিয়েই লেখা হয়েছে। বর্ণময় ইতিহাস রয়েছে বা কোনও ভাবে এক উজ্জ্বল ইতিহাসের ঠিকানা বয়ে চলেছে, শুধু সেই রঙ্গালয়ের কথাই বলা হল। কয়েকটি মঞ্চ ইতিহাসের পাতা ছাপিয়ে আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই নাট্যশালাগুলির দীর্ঘ ইতিহাস একবারে না বলে পর্যায় অনুসারে বলা হল। মঞ্চটির কালানুক্রমিক বিবর্তন এবং সমসাময়িক অন্যান্য মঞ্চের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে পাঠকদের সুবিধা হতে পারে। কলকাতার নাট্যচর্চার পরিসর আরও বড় এবং গভীর। নাট্য শোধ সংস্থানে সেই ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি সংরক্ষিত রয়েছে। পাঠকের জন্য সংস্থানের লাইব্রেরি এবং সংগ্রহশালা উন্মুক্ত।

কলকাতার জন্মলগ্ন থেকে বাঙালি এবং বাংলা সমাজ সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল উত্তর কলকাতা। স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালির তৈরি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রথম ঠিকানাও ছিল উত্তর কলকাতা। পরে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালিরা ছড়িয়ে গেলে রঙ্গমঞ্চও উত্তর থেকে চলে যায় অন্যান্য দিকে।

বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিহাস শুরু হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম থেকে। বাগবাজারের কয়েকজন তরুণের শখের নাট্য সম্প্রদায় বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (পরে নাম হয় শ্যামবাজার নাট্যসমাজ)। এই দলে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, ধর্মদাস সুর প্রমুখ। দলের রিহার্সাল এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। এই নাট্যদলই ১৮৭২ এর ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় করলেন দীনবন্ধু মিত্রর 'নীলদর্পন'। এখান থেকেই শুরু হল প্রথম বাংলা পেশাদারী মঞ্চের ইতিহাস। একই সাথে দল ভাঙা এবং গড়ার ইতিহাসও বটে। ওই নাট্যসমাজ থেকে যখন ন্যাশনাল থিয়েটার গঠিত হয় তখন দলে প্রথমে গিরিশচন্দ্র ছিলেন না। ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, ধর্মদাস সুর প্রমুখ। এই ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনয় করেছিলেন জোড়সাঁকোতে মধুসূদন সান্যাল নামক এক ভদ্রলোকের বাড়ির উঠনে। নিজস্ব কোনও পাকা মঞ্চ ছিলা না। এক বছরের মাথায় ২২ জানুয়ারি ১৮৭৩ অভিনয়ের পরে মতান্তরে এবং হিসাবের গোলমালে অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। পরে মধ্যস্থতা করেন শিশিরকুমার ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক), গিরিশচন্দ্র প্রমুখ। নতুন ডিরেক্টর হলেন শিশিরকুমার, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ। তারপরে আবার অভিনয় হল ৮ মার্চ পর্যন্ত। এরপরে বৃষ্টির জন্য অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। তারপরই অর্থ সংক্রান্ত গোলমালে ন্যাশনাল থিয়েটার দু ভাগ হয়ে গেল। একটি দলে গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর প্রমুখ, তাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটার নামটি রেজিস্ট্রি করে নিলেন। অন্যদলে ছিলেন অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। এঁরা নাম দিলেন হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। দুটি দলই বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করতে লাগলেন, কারোরই তখনও পর্যন্ত কোনও নিজস্ব মঞ্চ ছিল না।

বেঙ্গল থিয়েটার (১৮৭৩ – ১৯০১) এটি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম নিজস্ব মঞ্চ। আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) এর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের উদ্যোগে এবং উৎসাহে ১৮৭৩ এ কলকাতায় একটি নিজস্ব নাট্যগৃহ স্থাপিত হল। (৯, বিডন স্ট্রিট) এই মঞ্চ নির্মাণের জন্য শেয়ার বিক্রি করা হয়েছিল। প্রতিটি শেয়ার হাজার টাকা মূল্যে মোট আঠারজন এই শেয়ার কিনেছিলেন। প্রসঙ্গত বেঙ্গল থিয়েটারের পরিচালন কমিটিতে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়, যাঁরা মহিলা চরিত্র অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী নিয়োগ করেন। তৎকালে সাধারণ পরিবার থেকে মহিলা শিল্পী পাওয়া অসম্ভব ছিল তাই রঙ্গশালা কর্তৃপক্ষ বারাঙ্গনাদের ভিতর থেকে মহিলা

শিল্পী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যদিও বিদ্যাসাগর এই সিদ্ধান্ত মানতে না পারায় পদত্যাগ করে ছিলেন । পরবর্তীকালে এই মঞ্চের নাম হয় রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার। এই মঞ্চটির আয়ুষ্কাল ছিল ১৯০১ পর্যন্ত। পরে সেখানে তৈরি হয় বিডন স্ট্রিট পোস্ট অফিস।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩ – ১৮৭৭) ১৮৭৩ এ ভুবনমোহন নিয়োগী নিজের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠা করলেন আর একটি রঙ্গালয়। ৬, বিডন স্ট্রিটে একটি জমি ইজারা নিয়ে নির্মিত হল নিজস্ব নাট্যগৃহ। এটি পেশাদারী রঙ্গশালার দ্বিতীয় নিজস্ব মঞ্চ। এই মঞ্চেই ১৮৭৪ নাটককার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম আবির্ভাব (নাটক – পুরু বিক্রম, অভিনয়)। প্রসঙ্গত, গ্রেট ন্যাশনাল এ ১৮৭৬ সালে অভিনীত 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' এবং The Police of Pig and Sheep' নামে সরকার বিরোধী দুটি ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন অভিনয় করায় বৃটিশ সরকার জারি করল কুখ্যাত Dramatic Performance Act. বিভিন্ন সমস্যার কারণে ১৮৭৭এ ভুবনমোহন নিয়োগী থিয়েটারের লিজ হস্তান্তর করলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র এর নতুন নাম দিলেন ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৭ -১৮৮৬)। অনতিকাল পরে গিরিশচন্দ্র স্বত্ত্বাধিকার হস্তান্তর করলেন। এরপর বিভিন্ন হস্তান্তরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ১৮৮১তে ন্যাশনাল থিয়েটার এবং তার নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ নিলামে কিনে নিলেন প্রতাপচাঁদ জহুরি। মঞ্চের ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন গিরিশচন্দ্র। অন্য চাকরি ছেড়ে পুরো সময়ের পেশাদার নাট্যকর্মী হলেন তিনি। এই সময় থেকেই তিনি নাটক লিখতেও শুরু করলেন। প্রথম নাটক 'আগমনী'। অভিনীত হল এখানেই। এর বছরখানেক বাদে ১৮৮৩র ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। গিরিশচন্দ্র না থাকায় মঞ্চের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে। এবং একসময় থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে যায়। ভুবনমোহন নিয়োগী মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে আবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে মঞ্চ বিক্রি হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এই জমিতেই গড়ে উঠেছিল মিনার্ভা থিয়েটার। দলভাঙা দল গড়া নিয়েই চলতে লাগল সাধারণ রঙ্গালয়।

স্টার থিয়েটার (১৮৮৩ – ১৮৮৭) ১৮৮৩ তে গিরিশচন্দ্র তাঁর অনুবর্তীদের নিয়ে ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি নামে একটি নতুন নাট্যসম্প্রদায় গঠন করে বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয় করা শুরু করলেন। এই বছরই ব্যবসায়ী গুর্মুখ রাই, বিনোদিনীকে কাছে পাওয়ার শর্তে একটি মঞ্চ গড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন। নতুন একটি মঞ্চের জন্ম হল ২১ জুলাই, ১৮৮৩ সালে, ঠিকানা - ৬৮, বিডন স্ট্রিট । বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এই ঠিকানাটি গুরুত্বপূর্ণ। যদিও প্রথমে এই মঞ্চটি বিনোদিনীর নামে রাখবার কথা হলেও রেজিস্ট্রির সময় স্টার থিয়েটার নাম দেওয়া হয়। বছরের শেষদিকে গুর্মুখ রাই নিজেকে স্টার থেকে সরিয়ে নিলেন। তখন এর মালিক হলেন অমৃতলাল বসু, দাশুচরণ নিয়োগী প্রমুখ। এই মঞ্চেই ২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪তে গিরিশচন্দ্র লিখিত 'চৈতন্যলীলা' নাটকটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখতে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত, নটী বিনোদিনী এই নাটকে চৈতন্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। বিনোদিনী এই মঞ্চেই তাঁর জীবনের শেষ অভিনয় করেন ১ জানুয়ারি, ১৮৮৭ (নল দময়ন্তী এবং বেল্লিক বাজার)। কিন্তু এখানে গিরিশচন্দ্ররা খুব বেশিদিন থাকতে পারলেন না। ৩১ জুলাই, ১৮৮৭ 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনয়ের পরে কৌশলে স্টার সম্প্রদায়কে এই মঞ্চ থেকে উৎখাত করে নতুন একটি মঞ্চ তৈরি করলেন গোপালাল শীল।

এমারেল্ড থিয়েটার (১৮৮৭ – ১৯৯৬) ৮ অক্টোবর, ১৮৮৭ তে গোপাললাল শীল এই মঞ্চে প্রতিষ্ঠা করলেন। বাংলা নাট্যশালায় ডায়নামো চালিয়ে প্রথম বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। দু-একটি প্রযোজনার পরে মঞ্চ থেকে আশানুরূপ লাভ না হওয়ায় তিনি গিরিশচন্দ্র কে এমারেল্ডে নিয়ে এলেন। কিন্তু এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই গোপাললালের শখ মিটে গেলে তিনি লিজ হস্তান্তর করলেন মতিলাল সুরকে। এবার গিরিশচন্দ্র চলে এলেন স্টারে। ১৮৯৬ এ এমারেল্ড এর মালিকানা বদল হয়ে নতুন নাম হল সিটি থিয়েটার (১৮৯৬ – ১৮৯৭)

স্টার থিয়েটার (১৮৮৮ - ১৯১২) পূর্বতন স্টার সম্প্রদায় ৭৫-৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে (এখন ৭৯/৩/৪ বিধান সরণী, গ্রে স্ট্রিট ক্রসিং) এ শোভাবাজার রাজবাড়ির এই সম্পত্তিটি কিনে নিলেন এবং নতুন করে স্থাপন করলেন স্টার থিয়েটার।

প্রথম অভিনয় ২৫ মে, ১৮৮৮। নাটক – নসীরাম। কিছু আইনগত সমস্যার কারণে গিরিশচন্দ্র সেবক ছদ্মনামে এই নাটকটি রচনা করেছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে গিরিশচন্দ্র এই মঞ্চে যোগ দেন। পরে আবার চলে যান। গিরিশচন্দ্র চলে যাওয়ার পর স্টারে নতুন নাটককাররূপে উঠে এলেন অমৃতলাল বসু এবং রাজকৃষ্ণ রায়। পরে গিরিশচন্দ্র আবার ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ততদিনে স্টার নিজের পায় দাঁড়াতে শিখে নিয়েছে। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই স্টার চলছে। ১৮৯৮ এ স্টার মঞ্চে থিয়েটারের সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু করলেন। ১৮৯৯ সালে স্টার ইলেক্ট্রিক আলোয় নতুন করে সজ্জিত হল। ওই বছরই 'বিরহ' নাটকের মাধ্যমে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংযোগ ঘটে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের । যদিও ওই নাটক তেমন জনপ্রিয় হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্টারের মূল চালিকা শক্তি অমৃতলাল বসু। এই বছরেরই প্রথম দিকে স্টারে নাটককাররূপে যোগ দিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। পরে অবশ্য তিনি চলে গেলেন কোহিনূর থিয়েটারে। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে জোয়ার আসে। ১৯১২এ গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সমগ্র বাংলা থিয়েটারে একটা খারাপ সময় উপস্থিত হয়।

<u>মিনার্ভা থিয়েটার (১৮৯৩ – ১৯১২ পর্যায়)</u> ১৮৯৩ এ পূর্বতন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জমিতে এই নাট্যগৃহটি নির্মাণ করলেন নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। আজকের মিনার্ভা থিয়েটার এই নাট্যশালাটিরই ঐতিহ্য বহন করছে। উল্লেখ্য নাগেন্দ্রভূষণ ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারের প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। প্রসন্নকুমার প্রথম বাঙালি যিনি শখের নাট্যশালা (<u>হিন্দু থিয়েটার</u>) নির্মাণ করেছিলেন ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। যদিও সেখানে অভিনয় হয়েছিল ইংরাজি ভাষায়। (অভিনীত নাটক – জুলিয়াস সিজার –এর অংশ বিশেষ এবং উইলসন অনূদিত ভবভূতির উত্তররামচরিত)। মিনার্ভা থিয়েটার শুরু হয় গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং অনুবাদে 'ম্যাকবেথ' দিয়ে (২৮ জানুয়ারি, ১৮৯৩)। ১৮৯৫ তে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ওই বছরই ১৩ জুলাই একইসঙ্গে মিনার্ভা এবং স্টার উভয় মঞ্চেই অভিনীত হল গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকটি। ১৮৯৬ এ মতান্তরের কারণে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ত্যাগ করলে মঞ্চটি ক্রমে রুগ্ন হয়ে যায়। বিভিন্ন হাত বদল এবং জটিল ইতিহাসের ভিতর দিয়ে চলতে থাকে মিনার্ভা। ইতিমধ্যে বহু হাত বদল হতে থাকে এই নাট্যশালাটির। গিরিশচন্দ্রও এই সময় বহুবার তাঁর আনুগত্য বদল করেছেন। ১৯০৩ সালে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তিন বছরের জন্য লিজ নিলেন মিনার্ভা। ক্লাসিক ও মিনার্ভা দুটি মঞ্চ একসঙ্গে চালাতে গিয়ে অমরেন্দ্র ঋণগ্রস্ত হয়ে মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে প্রায় দশ হাজার টাকা ঋণ নিলেন শোধ করতে না পেরে বাকি সময়ের লিজ মনমোহন পাঁড়েকে লিজ হস্তান্তরিত করেন। মনোমোহন তাঁর বাল্যবন্ধু অপরেশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। ১৯০৫ এ আবার গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় ফিরে এলেন। এই বছরটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ বছর। দেশপ্রেমে উদ্বেলিত দ্বিজেন্দ্রলাল লিখলেন 'রাণা প্রতাপ'। বাংলা থিয়েটার নতুন নাটককার এলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। এই মিনার্ভা থেকেই বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আরও একজন নট ও নাটককার আবিষ্কৃত হলো – অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

<u>ক্লাসিক থিয়েটার (১৮৯৬ -১৯০৭)</u> সেই ৬৮, বিডন স্ট্রিটের ঠিকানায় গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার ইতিমধ্যে নাম এবং মালিক বদলে হয়েছে সিটি থিয়েটার। কয়েক মাসের মধ্যে সেটিও বন্ধ হয়ে যায় । বন্ধ হয়ে যাওয়া মঞ্চটি অমরেন্দ্রনাথ দত্ত নিয়ে তাঁর নতুন মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৯৬ সালে। প্রথম অভিনয় ১৮৯৭ এর ১৬ এপ্রিল। নাটক – নল-দময়ন্তী এবং বেল্লিকবাজার। এই মঞ্চেই নাটককার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের প্রথম মঞ্চ সফল নাটক 'আলিবাবা' অভিনীত হল ১৮৯৭ এই। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও কয়েকটি নাটক লিখলেন। সুখের বিষয় নাট্য শোধ সংস্থানে অমরেন্দ্রনাথ লিখিত একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। বাংলা পেশাদারী থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের কয়েকটি উদ্ভাবনের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। হাতে আঁকা সিনের জায়গায় অমরেন্দ্রনাথ আমদানী করলেন প্রকৃত আসবাবপত্র। এমনকী জীবন্ত ঘোড়াও হাজির করেছিলেন মঞ্চে। তাঁর নাট্য বিজ্ঞাপনেও নতুনত্বের ছোঁয়া ছিল। একসময় দর্শক আকর্ষণ করতে টিকিটের সঙ্গে উপহারও দিতে শুরু করেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন খুব বড় মাপের অভিনেতা। কিন্তু ভালো ব্যবসায়ী ছিলেন না। বেহিসেবী খরচের ফলে দেনায় ডুবে গেলেন। ১৯০৭ এ ক্লাসিক নিলামে উঠে গেল। এরপর অমরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন মঞ্চে একাধিক থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ১৯১৬।

কোহিনূর থিয়েটার (১৯০৭ – ১৯১৫) **ক্লাসিক থিয়েটার** উঠে যাওয়ার পর এমারেল্ড থিয়েটারের বাড়িটি নিলামে উঠলে সেই বাড়ি কিনে নিয়ে শরৎকুমার রায়, নতুন একটি নাট্যগৃহ তৈরি করলেন। এই মঞ্চটি চলেছিল ১৯১৫ পর্যন্ত। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি মনোমোহন পাঁড়ে এর আগেই মিনর্ভার সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ তে মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভা এবং কোহিনূর দুটি মঞ্চই এক সাথে দেখছেন। এই সময় তিনি স্থির করলেন মিনার্ভাকে সরিয়ে নিয়ে আসবেন কোহিনূরে। শিল্পীরা দুভাগ হয়ে গেলেন। দানীবাবু, তারাসুন্দরী প্রমুখ মনোমোহনবার সঙ্গে থেকে গেলেন। এদিকে কোহিনূর মঞ্চে মিনার্ভা নাম ব্যবহার করায় আবার মামলা হল এবং শেষ পর্যন্ত মানোমোহন পরাজিত হলেন। মিনার্ভা থিয়েটার চলে গেল নতুন মালিকের হাতে।

মনোমোহন থিয়েটার (১৯১৫ – ১৯২৪)। আবার হাত বদল হল ৬৮, বিডন স্ট্রিটের এই নাট্যগৃহটির। এবার কিনলেন মনোমোহন পাঁড়ে। তিনি নাম দিলেন মনোমোহন থিয়েটার। মনোমোহন চলেছিল ১৯২৪ পর্যন্ত। তারপর মালিক মনোমোহন পাঁড়ে সেটি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। খুব উল্লেখযোগ্য কোনও প্রযোজনা এখানে হয়নি ঠিকই, কিন্তু ঐতিহাসিক কারণেই ৬৮ বিডন স্ট্রিট এবং মনোমোহন থিয়েটার গুরুত্ব যথেষ্ট।

১৯১২ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত বাংলা থিয়েটার কিছুটা টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছিল। চালু মঞ্চগুলি যেমন স্টার, মিনার্ভা, কেউই খুব উল্লেখযোগ্য কোনও ছাপ রাখতে পারেননি। যদিও নতুন নাটকের খোঁজ, মঞ্চায়ন নতুন শিল্পীর আসা যওয়া এইসব নিয়মিত কাজ চলছিলই। ১৯১৩ থেকে ২২ পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারের ইতিহাসে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা নেই। ১৯২২এ মিনার্ভা পেশাদারী মঞ্চে দুজন নতুন শিল্পীকে স্বাগত জানালেন – রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং নরেশচন্দ্র মিত্র। উল্লেখ্য এঁরা দুজনেই শিক্ষিত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বস্তুত শিশিরকুমারের আগে শিক্ষিত – মধ্যবিত্ত ঘর থেকে থিয়েটারে আসার বিষয় খানিকটা অনীহা দেখা গিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যখন মিনার্ভা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তখনই ১৯২২ এ মিনার্ভা পুড়ে যায়। থিয়েটারে এক নতুন পর্ব শুরু হল বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক বৃহৎ গোষ্ঠী জে এফ ম্যাডানের নেতৃত্বে নাট্য ব্যবসায় প্রবেশ করলেন। প্রথমে হিন্দি পরে বাংলা থিয়েটারের জন্য তারা তৈরি করলেন মঞ্চ। হিন্দি থিয়েটারের জন্য **আলফ্রেড থিয়েটার**, প্রথমে ওই জমিতে কার্জন থিয়েটার নামে একটি নাট্যশালা ছিল, পরে বিভিন্ন হস্তান্তর এবং নাম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হল অলফ্রেড থিয়েটার (পরে ওই মঞ্চটি গ্রেস সিনেমা হলে রূপান্তরিত হয়)। বাংলা নাটক প্রযোজনার জন্য তারা কর্নওয়ালিশ সিনেমা কিনে তৈরি করলেন কর্নওয়ালিশ থিয়েটার (পরে এই মঞ্চ শ্রী সিনেমা হলে রূপান্তরিত হল)। তাঁরা বেঙ্গলি থিয়েট্রিকাল কম্পানি নাম দিয়ে একটি পুরো দস্তুর সংস্থাও খুললেন। নিয়মিত বাংলা থিয়েটার চালাতে হলে ভালো শিল্পী প্রয়োজন। এখানেই তারা নিয়ে এলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। অপেশাদার শখের থিয়েটারে অভিনয় করে তখন তাঁর বেশ নাম-ডাক। ১০ ডিসেম্বর ১৯২১ এ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাব, তাঁর 'আলমগীর' অভিনয় দিয়ে থিয়েটারে গিরিশ-অমরেন্দ্রনাথ পর্ব শেষ হল। অভিনয়, আলো মঞ্চ সজ্জা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর নতুন ভাবনা চিন্তায় শুরু হল নতুন এক অধ্যায়। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবে আবার মোড় ঘুরে গেল থিয়েটারে। শুধু মোড় ঘুরে যাওয়া নয় থিয়েটারে শুরু হল নতুন একটা যুগ। এরপর ১৯২২ এ এই মঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য চরিত্রে করলেন। অতঃপর মতান্তর হওয়ায় তিনি ম্যাডানদের সংস্থা ত্যাগ করেন।

স্টার (১৯২৩ -১৯৩৩ : পর্যন্ত পর্যায়) দর্শক আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে স্টার যখন ধুঁকছে সেই সময় যথার্থ পেশাদারী ভাবে পরিচালনা করার জন্য কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি পুঁজি ঢেলে গঠন করলেন একটি লিমিটেড কম্পানি – আর্ট থিয়েটার লিমিটেড। এই গোষ্ঠীর প্রোমোটার ছিলেন ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী কুমারকৃষ্ণ মিত্র, প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সমাজকর্মী নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। এই গোষ্ঠী স্টার পরিচালনার ভার হাতে নয়ে ১৯২৩ এ। আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টর ছিলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সচিব প্রবোধচন্দ্র গুঠাকুরতা। এই বিশিষ্ট নাট্য

প্রযোজকের আবির্ভাবে বাংলা পেশাদারী থিয়েটারে নতুন যুগের শুরু। প্রবোধচন্দ্রের উদ্ভাবনী প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায়। আর্ট থিয়েটার প্রথমে চেষ্টা চালায় শিশিরকুমারকে নিয়ে আসার, কিন্তু তা ফলপ্রসু না হওয়ায় তাঁরা নতুন মুখের সন্ধানে নেমে একে একে তুলে আনলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র মিত্র নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীদের। এক সময় স্টারের সাফল্যে আর্ট থিয়েটার ১৯২৭ এ প্রবোধচন্দ্রের উদ্যোগে হাতে নিলেন মনোমোহন থিয়েটার। একসঙ্গে চলতে থাকে দুটি মঞ্চ। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্যে প্রবোধচন্দ্র আর্ট থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। শুরু হল আর্ট থিয়েটারের অধোগতি। সেই সঙ্গে ১৯৩২ এ গিরিশচন্দ্রের পুত্র দানীবাবুর, ১৯৩৩ এ অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু আর্ট থিয়েটারের অন্তিমলগ্ন ঘোষণা করে দিল।

মিনার্ভা থিয়েটার (১৯২৫ – ১৯৩২ পর্যায়) ১৯২৫ এ আবার নতুন করে গঠিত হল মিনার্ভা। কিন্তু দর্শকমনে তেমন সাড়া ফেলতে ব্যর্থ হয়। ১৯২৮ এ নতুন নাটককার জলধর চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে ওখানে নাটক লিখছেন বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। ১৯৩০ এ এলেন অহীন্দ্র চৌধুরী। মনে রাখতে হবে ইতিমধ্যে কলকাতায় তখন সিনেমা চালু হয়ে গেছে। থিয়েটারের তুলনায় সেখানে প্রবেশমূল্য অনেক কম। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে মিনার্ভা প্রবেশমূল্য কিমিয়ে দেয়। কিন্তু ফল হয় উল্টো। দর্শক কিছু বৃদ্ধি পেলেও তাদের মান নেমে যায়। অহীন্দ্র চৌধুরী আবার স্টারে ফিরে গেলেন। মিনার্ভার আবার এক পতনের মুখে পৌঁছয়।
অহীন্দ্র চৌধুরী ১৯৩০ এ মিনার্ভায় যোগ দিলেন। এই মঞ্চে বিভিন্ন সময় যুক্ত ছিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এক সময় শম্ভু মিত্রর নির্দেশনায় বহুরূপীও তাঁদের ‘ছেঁড়াতার’ এবং ‘রক্তকরবী’ পেশাদারী ভাবে করবার চেষ্টা করেছিলেন যদিও মাত্র তিন মাসের মাথায় মিনার্ভার তৎকালীন কর্ণধার কৃষ্ণ কুণ্ডু তাঁদের মঞ্চ পরিত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৫৯ এ উৎপল দত্তর নেতৃত্বে লিটল থিয়েটার গ্রুপ (এলটিজি) [lxxii]মিনার্ভা লিজ নিয়েছিলেন এবং একটানা প্রায় দশ বছর পরে ১৯৬৯ এ ‘লেনিনের ডাক’ প্রযোজনা দিয়ে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘোষিত হল। এরপর আরও দশ বছর কোনক্রমে টিঁকে থাকার চেষ্টা করে এক সময় মঞ্চটি অব্যবহৃত হয়ে প্রায় ভগ্নদশায় পৌঁছায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিভিন্ন নাট্য ব্যক্তিত্বদের প্রচেষ্টায় মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র নামে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ নতুন রূপে আত্ম প্রকাশ ঘটে।

মনোমোহন নাট্যমন্দির (১৯২৪ – ১৯২৬) মনোমোহন পাঁড়ের হাত থেকে শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটার লিজ নিয়ে নতুন নাম দিলেন মনোমোহন নাট্যমন্দির। শিশিরকুমারের হাতেই ১৯২৪ এ পেশাদারী থিয়েটারে আরও একজন নতুন নাটককার এলেন –যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। তাঁর ‘সীতা’ নাটক শিশিরকুমারের নির্দেশনা ও অভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চকে বিপুল উচ্চতায় নিয়ে গেল। শিশিরকুমার দু বছরের মাথায় তিনি ওই মঞ্চটি ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন কর্নওয়ালিশ মঞ্চে। ১৯২৭ এ মঞ্চটি হাতে নিলেন আর্ট থিয়েটার লিমিটেড ১৯২৮ এ তাঁরা মঞ্চটি ছেড়ে দিলে মঞ্চটি হাতে নেয় মিত্র থিয়েটার।

মিত্র থিয়েটার (১৯২৬ – ১৯২৭) শিশিরকুমার মিত্র প্রথমে ম্যাডানদের অ্যালফ্রেড থিয়েটার ভাড়া নিয়ে চালু করেন মিত্র থিয়েটার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মঞ্চটি ছেড়ে দিয়ে উঠে এলেন মনমোহন থিয়েটারে। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তাঁরা আবার মঞ্চটি ছেড়ে দিলেন।

মনোমোহন থিয়েটার (১৯২৮ – ১৯৩১) মিত্র থিয়েটার মঞ্চটি ছেড়ে দিলে এবার হাতে নিলেন অরোরা ফিল্ম কম্পানির আনন্দী বসু। এখানে ম্যানেজার হয়ে এলেন গিরিশপুত্র দানীবাবু। এই মঞ্চেই প্রথম নাটককার রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। আনন্দী বসু অল্পদিনের মাথায় আবার লিজ হস্তান্তর করলেন আর্ট থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে আসা

প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতাকে। ওই মঞ্চে তাঁর প্রথম প্রযোজনা ১৯২৯এ 'জাহাঙ্গির'। ১৯৩০ এ প্রবোধচন্দ্র প্রযোজনা করলেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'গৈরিক পতাকা' এবং মন্মথ রায়ের 'কারাগার'। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাটকদুটির প্রভাব হল গভীর। ফলে বৃটিশ সরকার ১৯৩১ এর ৪ ফেব্রুয়ারি লাগু করলেন ১৮৭৬ এর সেই নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন এই প্রযোজনাদুটির বিরুদ্ধে। মনোমনোহন মঞ্চে শেষ প্রযোজনা হয়েছিল ১ মার্চ, ১৯৩১। ওই বছরই ৬৮ বিডন স্ট্রিটের ঐতিহাসিক বাড়িটি সেন্ট্রাল এভিনিউ (বর্তমানে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) তৈরি করার জন্য ভেঙে ফেলা হল।

কর্নওয়ালিশ মঞ্চ [নাট্যমন্দির লিমিটেড] (১৯২৬-১৯৩০) ১৯২৬ এ মনোমোহন থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে শিশিরকুমার ম্যাডানদের কর্নওয়ালিশ মঞ্চটি লিজ নিয়ে গঠন করলেন একটি লিমিটেড কম্পানি। নাম হল - নাট্যমন্দির লিমিটেড। রবীন্দ্রনাথের নাটককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। স্বয়ং কবি এই প্রযোজনার জন্য কয়েকটি নতুন গান রচনা করে দিয়েছিলেন। ১৯২৭এ তিনি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনি পেশাদারী মঞ্চে নিয়ে আসলেন। ১৯৩০ এ শিশিরকুমার ও সম্প্রদায় অভিনয় করতে আমেরিকা সফরে গেলেন।

রঙমহল (১৯৩১ – ২০০১) প্রতিষ্ঠিত হল কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং রবীন্দ্রমোহন রায়ের উদ্যোগে। পরে সেখানে যুক্ত হলেন ভারতের সমাজিক আন্দোলনে খ্যাতনামা কয়েকজন নির্মচন্দ্র চন্দ্র, হেমচন্দ্র দে, প্রমুখ। ঠিক এই সময় আমেরিকা থেকে ফিরে শিশিরকুমার নতুন মঞ্চের সন্ধানে ছিলেন। রঙমহলের আহ্বানে তিনি সেখানে চাকরি নিলেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নাটক শিশিরকুমারের নির্দেশনা এবং অভিনয়ে প্রযোজিত হল 'শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া'। কিন্তু চাকরি করতে ভালো না লাগায় তিনি ১৯৩২ এই রঙমহল ছেড়ে দিলেন। ১৯৩৩ সালে এই মঞ্চে 'মহানিশা' নাটকের প্রযোজনার জন্য বাংলা থিয়েটারের প্রথম রিভলবিং স্টেজ চালু হল সতু সেনের হাত ধরে। ১৯৩৭ এ রঙমহলে যোগ দিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। বাংলা থিয়েটারে আবার এক নতুন যুগ এল বীরেন্দ্রকৃষ্ণর হাতে। এই মঞ্চেই 'মেঘমুক্তি' নাটক থেকে বিধায়ক ভট্টচার্যর জনপ্রিয়তার শুরু। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময় এই মঞ্চ চলচিত্র জগতের বিভিন্ন নামী শিল্পীদের যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন যেমন অহীন্দ্র চৌধুরী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মঞ্চটি রুগ্ন হয়ে যায়। অন্যান্য মঞ্চের মত এই মঞ্চটিও শেষ পর্যন্ত ২৯ অগস্ট, ২০০১ পুড়ে যায়। বলাবাহুল্য স্টারের মত বর্ণময় ইতিহাস না থাকায় আর পুনর্নির্মিত হয়নি।

নাট্যনিকেতন (১৯৩১ – ১৯৪১ আনুমানিক) ১৯৩১ এর মার্চ মাসে প্রবোধচন্দ্র স্টার থিয়েটারের খুব কাছেই তৎকালের ২/এ রাজা রাজকিষেণ স্ট্রিটে স্থাপন করলেন নাট্য নিকেতন নামে একটি মঞ্চ। লক্ষণীয় এতদিন রঙ্গমঞ্চের নাম দেওয়া হত ইংরাজিতে। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রেরণায় নতুন মঞ্চের নামকরণ হতে লাগল বাংলায়। ১৯৩৬ এ নাট্যনিকেতনের হাত বদল হল ক্যালকাটা থিয়েটার্স লিমিটেড নামে, ১৯৩৮ এ পুনরায় প্রবোধচন্দ্রের হাতে ফিরে এল নাট্যনিকেতন নামে। গণনাট্যে যোগ দেওয়ার আগে শম্ভু মিত্র এই মঞ্চে শচীন সেনগুপ্তর 'ভারতবর্ষ' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৪১ এর শেষ দিকে শিশিরকুমার ভাদুড়ী রঙ্গালয়টি হাতে নিয়ে নতুন নাম দিলেন **শ্রীরঙ্গম**।

স্টার থিয়েটারে নবনাট্যমন্দির (১৯৩৪ – ১৯৩৭) ১৯৩২ – ১৯৩৪ পর্যন্ত শিশিরকুমারের হাতে কোনও মঞ্চ ছিল না। ১৯৩৪ এ স্টার মঞ্চটি ভাড়া নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন নবনাট্যমন্দির। ১৯৩৭ এ মালিকপক্ষের সঙ্গে ঝামেলায় স্টার ছেড়ে দিলেন।

স্টার থিয়েটার (১৯৩৭ – এখনও) এরপরে মঞ্চটি হাতে নেন সলিলকুমার মিত্র। তাঁর আমলে (১৯৩৭ – ১৯৭৭) দীর্ঘ তেত্রিশ বছর স্টারে সূচনা হয় এক গৌরবময় অধ্যায়। ওই বছরই নাটককার রূপে এখানে যোগ দিলেন মহেন্দ্র গুপ্ত। ইতিমধ্যে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার অন্য ধারার প্রযোজনা করে নাট্য দর্শকদের রুচি পরিবর্তনের প্রায়াসে সফল হয়েছে। ১৯৫৩ র শেষদিকে ক্রমাগত লোকসান হতে থাকায় কয়েক মাস অভিনয় বন্ধ রেখে নাট্যগৃহের আমূল সংস্কার করে রঙমহলের দেখানো পথে নিয়ে আসলেন চলচিত্র জগতের নামী অভিনেতা – উত্তমকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাবিত্রী

চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের। শুরু হল সিনেমার জনপ্রিয় শিল্পীদের সশরীরে মঞ্চে দেখানোর এক নতুন প্রচেষ্টা। স্টার কর্তৃপক্ষ নিয়ে এলেন নাটককার দেবনারায়ণ গুপ্তকে। ১৯৫৩ এ এই মঞ্চেই অভিনীত হল সতু সেনের আলোর মায়ায় ঘেরা 'শ্যামলী'। ১৯৫৬ তে স্টার আত্মপ্রকাশ করল প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রঙ্গমঞ্চ রূপে। ১৯৭১ এ মঞ্চটি হাতে নিলেন রঞ্জিতমল কাংকারিয়া। ১৯৯৯ তে স্টার থিয়েটার পুড়ে যায়। বহু জটিলতার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত ২০০৪ এর ১৩ অক্টোবর নতুন করে উদ্বোধন হয় আজকের স্টার থিয়েটারের।

<u>শ্রীরঙ্গম (১৯৪১-১৯৫৬)</u> প্রবোধচন্দ্রের হাত থেকে নাট্য নিকেতন হাতে নিয়ে শিশিরকুমার নতুন নাম রাখলেন শ্রীরঙ্গম। তাঁর নাট্য জীবনে এটাই শেষ মঞ্চ। কপর্দকশূণ্য এখান থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আর কোনও মঞ্চ তিনি হাতে নেননি। পঞ্চশোর্ধ নাট্যাচার্য চোদ্দ বছর স্থায়ী এই মঞ্চে বারোটি নতুন নাটক প্রযোজনা করলেন। উল্লেখ্য, এখানেই ১৯৪৫ এ বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন' মঞ্চস্থ হয়, গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় এবং শম্ভু মিত্রর নির্দেশনায় এই নাটক ভারতীয় থিয়েটারে নতুন যুগ নিয়ে আসে। সে এক আলাদা ইতিহাস। ১৯৪৬এ তিনি প্রযোজনা করলেন তুলসী লাহিড়ীর নাটক 'দুঃখীর ইমান'। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে প্রথম পরীক্ষামূলক প্রযোজনা। ১৯৫১ সালে মঞ্চস্থ করলেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর নাটক 'তখত-এ-তাউস'। ১৯৫৬ এ শিশিরকুমার এখান থেকে বিদায় নিলেন এবং মঞ্চটি হাতে নিলেন রাসবিহারী সরকার ও দক্ষিণারঞ্জন সরকার।

<u>থিয়েটার সেন্টার</u> (১৯৫৪-২০০০) সালে নিজের বাসভবনেই (৩১, চক্রবেড়িয়া রোড, সাউথ, কলকাতা) একটি ইন্টিমেট থিয়েটার তৈরি করেছিলেন নির্দেশক এবং নাটককার (ধনঞ্জয় বৈরাগী ছদ্মনামে) তরুণ রায় (১৯২৭ - ১৯৮৮)। ওঁর নির্দেশনায় এক সময় প্রচুর পেশাদারী থিয়েটার প্রযোজিত হয়েছিল এখানে। ১৯৬৪ তে মঞ্চটি পুড়ে গেলেও পরের বছর ১৪ নভেম্বর আবার একটি নতুন মঞ্চ ওখানে নির্মিত হয়। থিয়েটার সেন্টারের উল্লেখযোগ্য একটি কাজ ১৯৫৫ থেকে একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন। উল্লেখ্য, নাটককার-অভিনেতা মনোজ মিত্রর নাটক লেখার হাতে খড়ি ১৯৫৮ সালের থিয়েটার সেন্টার একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতায় 'মৃত্যুর চোখে জল' নাটক থেকেই।

<u>বিশ্বরূপা (১৯৫৬ -১৯৯৭)</u> নাট্যাচার্যর বিদায়ের পর শ্রীরঙ্গম মঞ্চটি হাতে নিলেন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী রাসবিহারী ও দক্ষিণারঞ্জন সরকার। মঞ্চটি হাতে নিয়ে নাম রাখলেন বিশ্বরূপা। সরকার ভাইয়েরা মঞ্চটি হাতে নিয়ে প্রায় নতুন করে ঢেলে সাজালেন। এই প্রথম মঞ্চে মহিলা টিকিট বিক্রেতা এবং usher নিয়োগ করা হল। ১৯৭১ এ প্রযোজিত হল শঙ্কর রচিত উপন্যাস অবলম্বনে 'চৌরঙ্গী'। থিয়েটারে প্রথম এসে গেল ক্যাবারে নাচ। পরবর্তীকালে বিশ্বরূপায় অভিনয় শিল্পীরূপে যোগ দিলেন তৃপ্তি মিত্র। এলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, পাহাড়ী সান্যাল প্রমুখ। ১৯৯৭ এর মে মাসে মঞ্চটি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শেষ পর্যন্ত ২০০০ এর কালিপুজোর রাতে আগুনে পুড়ে যায় এই রঙ্গশালা। এখন সেখানে একটি বহুতল নির্মিত হয়েছে। নাট্যশালাটি অবলুপ্ত।

<u>কাশী-বিশ্বনাথ মঞ্চ (১৯৬৩ -)</u> বাংলা পেশাদারী থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকে থিয়েটার পাড়া হয়ে উঠেছিল বিডন স্ট্রিট – হাতিবাগান এলাকা। প্রায় নব্বই বছর পর ১৯৬৩তে পূর্বোক্ত অঞ্চলের বাইরে নতুন কিছু মঞ্চ তৈরি হতে লাগল। সেই যাত্রায় পথপ্রদর্শক পূর্ব কলকাতায় মানিকতলার কাছে কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ। এখানে প্রযোজিত হয়েছিল পেশাদারী থিয়েটারের বহু উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা বিশেষ করে বাংলা সিনেমায় জনপ্রিয় কিছু নাটক। এই মঞ্চেই প্রযোজিত হল বাংলা থিয়েটারে এখনও পর্যন্ত আলোচিত প্রযোজনা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নাম জীবন'।

<u>প্রতাপ মেমোরিয়াল হল</u> (১৯৬৭) প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের নামে উৎসর্গ করা একটি ভবনকে রূপান্তরিত করা হল মঞ্চে। ১৯৭২ এ এখানেই তোলপাড় করে দেওয়া চতুর্মুখ প্রযোজিত সুবোধ ঘোষের কাহিনি অবলম্বনে অসীম চক্রবর্তীর 'বারবধূ'। গীত রচনা করলেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, সুরকার নচিকেতা ঘোষ। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কেতকী দত্ত। সব কালের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে ১৮০০ রাত্রি চলেছিল এই নাটক ।

রঙ্গনা (১৯৭০ -) মূলত গনেশ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধু গোলক পালের উদ্যোগে এই মঞ্চটির জন্ম। জন্মের বছর থেকেই ১৯৭৬ পর্যন্ত নান্দীকার এখানে নিয়মিত অভিনয় করেন। ১৯৭৬ থেকে শুরু হয় রঙ্গনার নিজস্ব প্রযোজনা। ৮ মে ২০০৮ গনেশ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর থেকে মঞ্চটি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

নাট্য শোধ সংস্থানের আর্কাইভ সংগ্রহ : কলকাতার কয়েকটি রঙ্গালয়

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩-১৮৭৭) ৬, বিডন স্ট্রিট

বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার (৬৮, বিডন স্ট্রিট): ১৮৮৩ – ১৮৮৭

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার – (পুড়ে যাওয়ার আগে)

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার – এখন (পুড়ে যাওয়ার পরে)

আজকের মিনার্ভা থিয়েটার

বিশ্বরূপা থিয়েটার (১৯৫৬ -১৯৯৭)

থিয়েটার সেন্টার (১৯৫৪ -২০০০)

টীকা

[i] শিক্ষাবিদ, নাট্য গবেষক, সমালোচক ও নাটককার (১৯৩৭-)
[ii] নাট্য ও চলচিত্র অভিনেতা (১৯২৬ – ২০০৬)
[iii] নাট্য ও চলচিত্র অভিনেতা (১৯৩১ – ১৯৯৭)
[iv] নাটককার নাট্যব্যক্তিত্ব (১৯১০-২০০০)
[v] সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)
[vi] তারাশঙ্কর রচিত উপন্যাস। নাটক ও চলচিত্রে রূপায়িত
[vii] নাটককার (১৯২৬ – ১৯৮৯)
[viii] জরাসন্ধের কাহিনির নাট্যরূপ (১৯৭২) প্রযোজনা কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ
[ix] ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নাট্যমঞ্চ।
[x] তারাশঙ্করের কাহিনি অবলম্বনে কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ প্রযোজিত (১৯৭৫)
[xi] অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৬ – ২০০৭)
[xii] সাহিত্যিক (১৯০৮-১৯৫৬)
[xiii] মাস থিয়েটার প্রযোজনা (১৯৭০)
[xiv] সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধয়ায়ের ছদ্মনাম (১৮৯৯-১৭৭৯)
[xv] বনফুল রচিত ভীমপলশ্রী গল্পের নাট্যরূপ 'অঘটন' কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ প্রযোজিত (১৯৭২)
[xvi] বীরু মুখোপাধ্যায়ের নাটক। বাসুদেব মঞ্চ প্রযোজনা (১৯৭২)
[xvii] সাহিত্যিক (১৯২০-২০১৪)
[xviii] জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত ও অভিনীত বিশ্বরূপা (১৯৮৩)
[xix] সুরকার ও নাট্য সমালোচক দেবাশিস দাশগুপ্ত (১৯৩৪-১৯৯১)
[xx] রঙমহল প্রযোজিত (১৯৫৪) নীহাররঞ্জন গুপ্তর নাটক। নির্দেশনা-অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়
[xxi] স্টার থিয়েটার প্রযোজিত (১৯৫৩) নিরুপমাদেবীর উপন্যাস, নাটক – দেবনারায়ণ গুপ্ত, নির্দেশনা-শিশির মল্লিক ও যামিনী মিত্র।
[xxii] LTG প্রযোজনা (১৯৫৭) নাটক – উমানাথ ভট্টাচার্য, নির্দেশনা –উৎপল দত্ত
[xxiii] LTG প্রযোজনা (১৯৫৯) নাটক-নির্দেশনা অভিনয় উৎপল দত্ত
[xxiv] সেতার শিল্পী(১৯২০-২০১২)
[xxv] মিনার্ভা থিয়েটার উৎপল দত্ত রচিত পরিচালিত ও অভিনীত (১৯৫৯)
[xxvi] সমরেশ বসুর উপন্যাসের নাট্যরূপ। নেতাজী সুবাষ মঞ্চ প্রযোজনা (১৯৭৫)
[xxvii] রঙমহল প্রযোজনা (১৯৭৮)।
[xxviii] ১৯৩১ প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চ
[xxix] অভিনেতা-পরিচালক (১৯২৪-১৯৯০)
[xxx] কাহিনি চিত্রনাট্য পরিচালনা সত্যজিৎ রায় (১৯৮০)
[xxxi] শেখর চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত। বিজন থিয়েটার (১৯৮০)
[xxxii] নাটককার। (১৮৯২-১৯৬১)
[xxxiii] মঞ্চ ও চলচিত্র শিল্পী (১৯৩৯-)
[xxxiv] সাহিত্যিক (১৯১৪-১৯৭৯)
[xxxv] শেখর চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল (প্রতিষ্ঠা – ১৯৫৮)
[xxxvi] শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয় (১৯৪১-১৯৫৬)
[xxxvii] সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর অতর্থী (১৮৯০-১৯৬৪) লিখিত একমাত্র নাটক প্রযোজনা শিশিরকুমার (১৯৫১)
[xxxviii] অভিনেতা ও নাট্য সংগঠক (১৯৯৮-১৯৫৪)
[xxxix] অভিনেতা (১৯৩০-১৯৯৮)
[xl] অভিনেতা (১৯১২-১৯৯৩)
[xli] নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪)

[xlii] তারাশঙ্কর রচিত নাটক। প্রযোজনা রঙমহল(১৯৪৪)
[xliii] বিংশ শতাব্দী নাটকে অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তা। অনিমার ভূমিকায় অভিনয় করেন।
[xliv] উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস। নাট্যরূপ-দেবনারায়ণ গুপ্ত, অভিনয় –রঙমহল (১৯৪৬)
[xlv] দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত ঐতিহাসিক নাটক (১৯০৯)
[xlvi] ১৮৮৩ সালে কলকাতার বিডন স্ট্রিটে স্থাপিত হয়, পরে ১৮৮৮ সালে পুনর্গঠিত হয় কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে
[xlvii] অভিনেতা নাট্যশিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি
[xlviii] সাহিত্যিক (১৯০৫-১৯৮৩)
[xlix] সাহিত্যিক (১৯০৯-১৯৮৩)
[l] সাহিত্যিক (১৯১২-১৯৯১)
[li] নট-নাটককার-অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৯৪৪-১৯১২)
[lii] নাটককার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)
[liii] নাটক-ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৯৭)
[liv] নাটক-অমৃতলাল বসু (১৯১২)
[lv] নাটক – অমৃতলাল বসু, প্রযোজনা – মিনার্ভা (১৯২৬)
[lvi] নাটক – অমৃতলাল বসু, প্রযোজনা – মিনার্ভা (১৯১৪)
[lvii] নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৯-১৯৫৯)
[lviii] পেশাদার মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনয় শিল্পী (১৯০৩-১৯৫২)।
[lix] রাধিকামোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৬-১৯৩৯), শ্রীকৃষ্ণ নাটকে শিশুপাল চরিত্রের শিল্পী।
[lx] কলকাতার রাজারাজকৃষ্ণ স্ট্রিটে স্থাপিত মঞ্চ (১৯৫৬)
[lxi] কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত একমাত্র এরিনা থিয়েটার (১৯৭৬)
[lxii] নাটক-দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯১১)
[lxiii] এই নামে দুটি বাংলা ঐতিহাসিক নাটক পাওয়া যায়। প্রথমটি গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত মিনার্ভা মঞ্চে প্রযোজিত (১৯০৫), দ্বিতীয়টি শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত, নাট্যনিকেতন মঞ্চে অভিনীত(১৯৩৮)
[lxiv] সুবোধ ঘোষের গল্প অবলম্বনে রঙমহল প্রযোজিত নাটক (১৯৭৯)
[lxv] রসরাজ অমৃতলাল বসু। (১৮৫৩ -১৯২৯)
[lxvi] অভিনয় শিল্পী (১৮৭৮-১৯৪৮)
[lxvii] নট ও নৃত্যশিক্ষক (১৮৬৭-১৯২৭)
[lxviii] বিশ্বরূপা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী। সরকার ব্রাদার্স প্রাইভেট লিমিটেড এর অন্যতম অধিকর্তা
[lxix] পালাকার এবং যাত্রাশিল্পী (বড় ফণীবাবু নামে পরিচিত। ১৮৯৬-১৯৬৮)
[lxx] পার্শি দৃশ্যপট শিল্পী। ম্যাজিক এবং মঞ্চমায়া সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।
[lxxi] অভিনয় শিল্পী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৩-১৯৪৩)
[lxxii] উৎপল প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল (১৯৪৮-১৯৬৯)